২৪১

সাক্ষরতা বুলেটিন

আষাঢ় ১৪২১
জুন ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪১ আষাঢ় ১৪২১ জুন ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ প্রকাশিত রচনাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মতামত সম্পূর্ণত লেখকের, গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সূ চি প ত্র

৩ **মো. রইছউল আলম মণ্ডল**
বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

৭ **মুহম্মদ হাসান খালেদ**
জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনা

১০ **তপন কুমার দাশ**
লুণ্ঠিত জলাধার: লোনা জলের পদধ্বনি

১৩ **ড. ওবায়দুল করিম**
দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন: আমাদের করণীয়

১৬ **সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া**
গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং অর্থনীতি

১৮ **রাশেদা কে. চৌধূরী**
শিক্ষার মান বাড়াতে চাই বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ

২০ **রফিকুল ইসলাম খোকন ও বাবুল সরদার**
এখন নতুনভাবে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে হবে

২২ **বিশেষ প্রতিবেদন**
ক. বেড়ে ওঠার গল্প
খ. একজন দেলোয়ারের একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠা

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

মো. রইছউল আলম মণ্ডল

বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

পটভূমি

বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মানবসভ্যতা তথা পৃথিবীর নিরাপত্তার প্রতি গুরুতর হুমকি হিসেবে এ সমস্যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১৮ শতকের শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে মূলত শিল্পোন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির নামে জীবাশ্ম জ্বালানীর যথেচ্ছা ব্যবহার, কার্বন শোষণকারী বনভূমির ব্যাপক বিনাশ ঘটিয়ে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন আনায়ন তথা মানুষের বিলাসী জীবন-যাপনের প্রয়োজনে অপরিমিত পণ্য ও সেবা যোগানোর জন্য বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার অনুষঙ্গ গ্রীনহাউস গ্যাসের ব্যাপক নির্গমণ আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখ্য, বায়ুমন্ডলে সঞ্চিত স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত গ্রীনহাউস গ্যাস ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত তাপ ধরে রেখে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট গবেষণার জন্য বিশ্বের প্রতিযশা বিজ্ঞানী ও সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বোচ্চ সংস্থা, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - এর সাম্প্রতিকতম গবেষণা প্রতিবেদনে (Fifth Assessment Report) বলা হয়েছে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের মারাত্মক প্রভাব থেকে উন্নত ও উন্নয়নশীল কোন দেশেই নিরাপদ নয় এবং সকল দেশকে এই গুরুতর হুমকি মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আইপিসিসি-র সর্বশেষ প্রতিবেদনে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার বিষয়ে উল্লিখিত মূল তথ্যসমূহ হলো-

- শিল্প বিপ্লবপূর্ব সময়ের তুলনায় বায়ুমন্ডলে প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ পিপিএম অতিক্রম করেছে এবং এর মূল কারণ হলো জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক ব্যবহার। অন্যদিকে সমুদ্র এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রায় ৩০% শোষণ করার ফলে সমুদ্রে অম্লতা (Ocean Acidification) বহু গুণে বেড়ে গেছে। আর একই সময়ে গ্রীনহাউস গ্যাস মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৬০% ও ২০%। এর ফলে বিগত ১৮৮০ থেকে ২০১২ পর্যন্ত পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৮৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে অনেক বেশী বেড়েছে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে একদিকে সমুদ্রের পানির স্ফীতি ঘটেছে; অন্যদিকে গত বিশ বছরে গ্রীনল্যাণ্ড, এন্টার্কটিক, আর্কটিক, উত্তর হেমিস্ফিয়ারসহ বিভিন্ন হিমবাহের বরফ ব্যাপকভাবে গলেছে। ১৯০১ হতে ২০১০ এর মধ্যে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ১৯ সে.মি-এর বেশী। এটি বিভিন্ন অঞ্চলভেদে আরো বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত নেতিবাচক প্রভাবে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উঁচু জলোচ্ছ্বাস, সাধারণ জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাবে কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য অনুপুযুক্ত হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের জন্য এই সমস্যা দিনে দিনে মারাত্মক আকার ধারন করেছে।

এহেন প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো-Raise your voice, not the sea level (যার বাংলা ভাবানুবাদঃ হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবো না আর)। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যতম প্রধান সমস্যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতি বিশ্ববাসীর যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ছোট ছোট দ্বীপসমূহ (Small Island Developing States) সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৪ সালকে The International Year of Small Island Developing States ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ঋতু চক্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষিজাত পণ্যের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এছাড়া, কোন অঞ্চলে অতি বৃষ্টিপাতজনিত আকস্মিক ও তীব্র বন্যা, আবার কোন অঞ্চলে ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরা, ঘনঘন ও থব্রিতর ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি তৈরি ও উঁচু জলোচ্ছ্বাস, নদী মোহনা ও তীরের ব্যাপক ভাঙ্গন, নদীর প্রবাহ ক্ষীণ হওয়া, ভূমি ধ্বস, রোগ জীবাণুর ব্যাপক বিস্তার, সহায়-সম্পদ ও বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি, ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জীবন-জীবিকাসহ সার্বিক অর্থনীতির উপর মারাত্মক অভিঘাত পড়ছে। এদিকে বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, নিচু ভূমি, জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব, দুর্বল অবকাঠামো, মাত্রাধিক দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরতার কারণে এ বিপন্নতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে গৃহীত কার্যক্রম

এটা বিশ্বব্যপী স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বিপন্ন কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি। অন্যদিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণ গ্রীন হাইজ গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান খুবই সামান্য (বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ ০.৩ টনের মতো) এবং স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের তালিকায় অনেক বিষয় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানোর বা অভিযোজন (Adaptation) এবং প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Mitigation)-এই দুই খাতেই বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে-

১. জলবায়ু পরিবর্তনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় জাতীয় ও সেক্টরাল নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন, বিধিমালা, ইত্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

২. জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়কে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় অঙ্গীভূত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নয়নে (Climate resilient development) যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অভিযোজন ও প্রশমন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম/প্রকল্প/উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;

৪. জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

এদিকে সরকার দেশকে আরো জলবায়ুসহিষ্ণু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণে বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতা নিয়ে বিগত দশকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রাণালয় কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), ২০০৯-এর আওতায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় চিহ্নিত ৪৪টি কর্মসূচিতে ১৩৩টি কার্যক্রমের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (Bangladesh Climate Change Trust Fund, BCCTF) গঠন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিগ্রস্ত দেশসমুহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব উৎস তথা রাজস্ব খাত থেকে এই তহবিল গঠন করেছে। ২০০৯-১০ থেকে শুরু করে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট ২৭০০ (দুই হাজার সাতশত) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত মূলত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তন্মধ্যে ৩১টি সরকারী প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৩৯টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে BCCSAP কর্মপরিকল্পনাটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তর বিশেষায়িত কারিগরি দপ্তর হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় তথ্য কারিগরি পরামর্শ দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের আর্থিক সহায়তায় ২০১১ সালে একটি Multi-Donor ট্রাস্ট ফান্ড Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ উক্ত তহবিলে প্রায় ১৮৭ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে।

এদিকে সরকার বিভিন্ন সময়ে যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে তার মধ্যে রয়েছে-পল্লী এলাকায় হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার নিম্নাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং মারাত্মক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাঁদেরকে রক্ষার জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, জোয়ারের প্লাবন ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০০০ কিলোমিটার বাঁধ ও বেড়িবাঁধ প্রকল্পসহ উপকূলীয় বাঁধ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস থেকে জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ঘূর্ণিঝড় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র এবং নদীতে বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি এবং বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে কৃষকদের স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের সংমিশ্রণে লবণাক্ততা, খরা ও বন্যাসহিষ্ণু অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও অন্যান্য শস্যের জাত উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনের জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় ৯০০০ কিলোমিটার গরাণ বৃক্ষরোপণসহ উপকূলীয় 'সবুজ বেষ্টনী' প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

- Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection শীর্ষক প্রকল্প;
- ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা ও ধানমণ্ডি এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশি এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি-আর পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প);
- সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/ মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর) কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ করে তা Aerobic Composting পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার জন্য Programmatic CDM project using Municipal Organic Waste of 64 Districts of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- Market Development Initiative for Bondhu Chula (Imoroved Cooking Stoves) শীর্ষক প্রকল্প- এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ও জার্মান সরকারের যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যে সারাদেশে ৫ লক্ষের অধিক জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশসম্মত উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) বিতরণ করা হয়েছে এবং এ বছরের মধ্যেই ১০ লক্ষ বন্ধু চুলা বিতরণের লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে BCCRF এর অর্থায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর / সংস্থা কর্তৃক বেশ কয়েকটি বড় আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, সিডিএমপি-র আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়নাধীন ক্লাইমেট চেঞ্জ সেলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, বিভিন্ন গাইডলাইন, ভিডিও ডকুমেন্টারী ও ফ্যাক্ট শীট প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী ও সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন, যা এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। Global Environment Facility (GEF)-এর আর্থিক অনুদানে ও ইউনেপের কারিগরি সহযোগিতায় Ecosystem Based Approaches to Adaptation (EBA) in the Drought-prone Barind Tract & Haor Wetland Area শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য শক্তি বা জ্বালানীর উন্নয়ন ও প্রসারে নিজস্ব অর্থায়নে এবং দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারিদের সহযোগিতায় খুবই উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে বিশেষ করে বিদ্যুতের সরবরাহ পৌঁছেনি এমন দূরবর্তী এলাকার প্রায় চব্বিশ লক্ষের অধিক বাড়িতে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে ৫০০

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদিকে জ্বালানী সংরক্ষণের অংশ হিসেবে সরকার তিন কোটি সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উন্নত বাল্ব (সিএফএল) প্রতিস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ এফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সরকার পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল ও সম্পদ নিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর এই দেশের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২১টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- পরিবেশ সংরক্ষণে পানি, বায়ু, মাটি ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাট রোধ, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও এর পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- দূষণকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্টরের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়;
- রিডিউস-রিউজ-রিসাইক্লিং (Reduce-Reuse-Recycling: 3Rs)-কে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
- শিল্প বর্জ্য, ভূ-পরিস্থ পানি, বায়ুর গুণগতমান পরিবীক্ষণ;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে কার্যকর অবদান রাখা;
- পরিবেশ আইন ও বিধিমালার যুগোপযোগীকরণ এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের যথার্থ প্রয়োগ; পরিবেশ আদালতে মামলা পরিচালনাসহ উচ্চ আদালতে রিট মামলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে 'মিট দ্য পিপল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের পরিবেশসংশ্লিষ্ট সমস্যা শ্রবণ ও যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে পরিবেশ বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান, ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে গত পাঁচ বছরে নতুন ৮১২টি শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি স্থাপিত হয়েছে। একই সময়ে প্রায় ২১৪১টি বায়ুদূষণকারী ইট ভাটা আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বায়ুমান পরিবীক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। Polluters' Pay Principle-এর আওতায় শিল্পদূষণ, বায়ুদূষণ, পাহাড় কাটা, নদী ও জলাশয় ভরাটের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের জন্য গত জুলাই ২০১০ হতে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ১৭৮৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ১০৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, গত পাঁচ বছরে অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী ৬৪২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২৬৭ টন পলিথিন জব্দ, ৬২টি কারখানা বন্ধ এবং প্রায় ৪ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর তার বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রম করছে তার প্রধান কয়েকটি হলো:

১. উন্নয়নের সকল খাতে পরিবেশকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
২. শতভাগ শিল্পকারখানাকে পরিবেশ আইন প্রতিপালনের আওতায় আনা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা;
৩. অবিলম্বে হাজারিবাগের ট্যানারীকে সাভারে স্থানান্তর করা;
৪. অবিলম্বে দূষণকারী ইট ভাটাকে জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা;
৫. রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়সহ অবশিষ্ট ৪৩টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপনসহ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়, দেশের পরিবেশবান্ধব জলবায়ু পরিবর্তন-সহিষ্ণু টেকসই উন্নয়নে বৈদেশিক উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পার্টনারশীপ প্রচেষ্টাকে আরো সংহত ও কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া এনজিও, সিভিল সোসাইটি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস ২০২১ সালের মধ্যে দেশে পরিবেশবান্ধব জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে।

মো. রইছউল আলম মণ্ডল
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

[বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বই থেকে গৃহীত]

মুহম্মদ হাসান খালেদ

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯.৯৫ শতাংশ (বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ: ২০১১)। কৃষি এককভাবে জিডিপির সর্ববৃহৎ খাত। জিডিপিতে কৃষির অবদান শতকরা হিসেবে কমছে। তবে দিনে দিনে দেশের জিডিপি-র আকারও বড় হচ্ছে। কৃষি খাতে দেশের মোট কর্মশক্তির প্রায় ৪৭.৫ শতাংশ লোক নিয়োজিত রয়েছে (শ্রম জরিপ-২০১০, বিবিএস)। কয়েক দশকে দেশের কৃষি খাতে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের দেশে শস্য, মৎস্য সম্পদ, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ নিয়েই মূলত কৃষিখাত। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির এসকল উপ-খাতের অবদান যথাক্রমে ১১.৩৪, ৪.৪৯, ২.৬৬ এবং ১.৭৪ শতাংশ (বিবিএস-২০১০)।

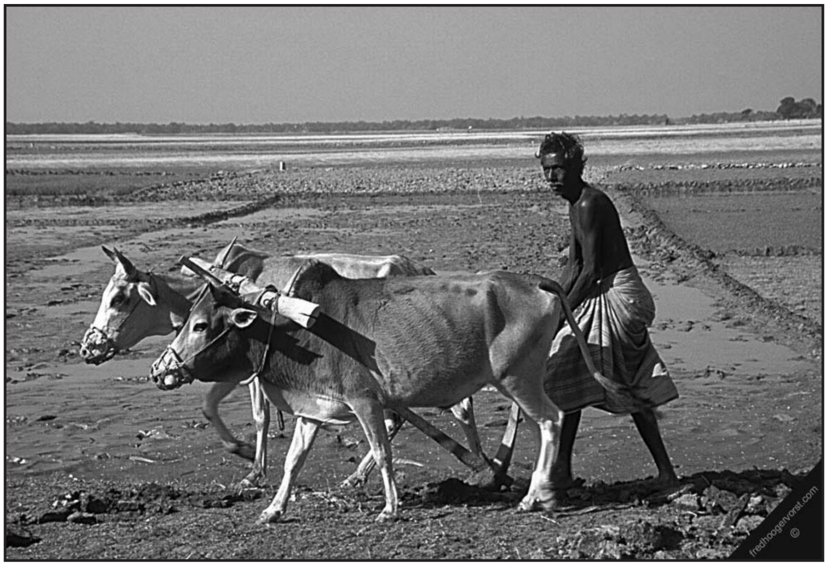

বাংলাদেশের অনেক কৃষি জমি বর্তমানে একের অধিক ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বছর জুড়ে শস্যের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির নিবিড়তা বেড়ে চলছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন এবং মৌসুমী বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। কৃষির উপ-খাত মৎস্য ও পশু খাতের ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সকল খাতেও কর্মসংস্থান বাড়ছে। কৃষিতে মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি খাতের উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তাসহ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ বিশ্বের অতিমাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। বৈশিক উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের কৃষির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ইত্যাদি অভিঘাত বাড়ছে। ফলে দেশের কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়ন প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

যে কোন দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমানে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কৃষি উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আমাদের কৃষি উন্নয়নের ভাবনায় সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে কৃষকের উন্নয়নকে। কৃষকের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কৃষি ব্যবস্থাপনায় কৃষকের সম্পৃক্ততা। এছাড়াও প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ঋণের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবেলায় কৃষিতে দুর্যোগ সহনশীল ও প্রতিরোধী প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনয়ন অতি জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেই পৃথিবীতে আজ প্রাণের অস্তিত্ব। সৃষ্টিলগ্ন হতে পৃথিবীর জলবায়ু ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। অনুকূল জলবায়ুর কারণে বিশ্বে এত জীববৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি অস্তিত্বমান। মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের তড়িৎ গতির সাথে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী খাপ খাওয়ানোর গতি অতি মন্থর। তাই বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বা Climate Change। জলবায়ু

পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর গড় বাৎসরিক তাপমাত্রা বাড়বে, বৃষ্টি ও তুষারপাতে পরিবর্তন হবে, চরম আবহাওয়াজনিত (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) ঘটনার পৌনঃপুনিকতা বাড়বে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নীচু উপকূলীয় এলাকা লবণাক্ত পানির নীচে তলিয়ে যাবে। কৃষির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যা প্রকটতর হবে। সামগ্রিকভাবে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বর্তমান পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি আরও সংকটাপন্ন হবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অসহায়ত্বের শিকার। International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) এর মতে, বাংলাদেশ অধিকতর বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। যেসকল দেশে সুনামির ঝুঁকি রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান তাদের মাঝে তৃতীয় এবং মনুষ্য ক্ষতির বিবেচনায় সাইক্লোন ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। জার্মানভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'জার্মান ওয়াচ' ২০০৮ সালে পোল্যান্ডের 'জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন' এ জানিয়েছে, ২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ হল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ।

জলবায়ু পরিবর্তন দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির ফলে দেশ বাৎসরিক ৩-৪ শতাংশ বাড়তি জিডিপি অর্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তড়িৎ জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নাজুকতা বৃদ্ধি করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার হচ্ছে দেশের কৃষককূল। বাংলাদেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষি ব্যবস্থাপনা একটি পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান। কৃষি উৎপাদনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি, অভিনব চিন্তাধারা, গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তন দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির ফলে দেশ বাৎসরিক ৩-৪ শতাংশ বাড়তি জিডিপি অর্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তড়িৎ জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নাজুকতা বৃদ্ধি করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার হচ্ছে দেশের কৃষককূল। বাংলাদেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষি ব্যবস্থাপনা একটি পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান। কৃষি উৎপাদনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি, অভিনব চিন্তাধারা, গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের কৃষি খাতও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। মৌসুমী বৃষ্টি, যথাসময়ে শীতের উপস্থিতি, ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানির উপস্থিতি এবং সর্বোপরি সহিষ্ণু আবহাওয়া আমাদের দেশের কৃষির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের ফসলের দিনপঞ্জি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং জমির উর্বরতা শক্তিও আংশিক অথবা পুরোপুরি কমে আসছে। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করেছে। 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)' এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে লবণাক্ত জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার হেক্টর এবং যা ক্রমাগত বাড়ছে। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫শে নভেম্বর ২০১২)।

National Adaptation Programme Action (NAPA) কর্তৃক জরিপে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি সেক্টরে তিনটি প্রধান আশঙ্কাজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে- (ক) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার প্রভাব আরো বিরূপ আকার ধারণ করবে; (খ) উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে; (গ) দেশে আরো প্রবল বন্যা, প্রচণ্ড ঝড় দেখা যাবে। বোরো মৌসুম মার্চ-এপ্রিল মাসে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সে. এর বেশি হলে ধানে চিটার পরিমাণ বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বোরো উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমে যেতে পারে। বরিশালকে এক সময় বলা হতো দেশের 'শস্য ভাণ্ডার'। এখন বরিশাল চরম খাদ্য ঘাটতিসম্পন্ন একটি এলাকা। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গমে ফুল আসার সময় পরাগ রেণু তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে গমের ফলন কমে যাচ্ছে এবং দানা ছোট হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন কমবে প্রায় ৮% এবং গমের প্রায় ৩২%। বাংলাদেশে Bangladesh Poultry Industries Association (BPIA) এর তথ্য মতে, ২০১২ সালের শৈত্যপ্রবাহে দেশে প্রায় ২০,০০০ মুরগি মারা গিয়েছে। দৈনিক ডিম উৎপাদন ৩.০ লক্ষ হতে ২.৭০ লক্ষে নেমে এসেছে এবং ব্রয়লার মুরগির ওজন কমে এসেছে (IDLC

Monthly Business Review, জানুয়ারি, ২০১৩)। ঘন ঘন ফসলহানির কারণে দ্রব্যমূল্যের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং কৃষি-নির্ভর দরিদ্র মানুষের আয়ের পথ ঠিক রাখার লক্ষ্যে দেশে ইতোমধ্যে বন্যা, লবণাক্ততা ও খরাসহিষ্ণু ধান, আগাম ধান ও পাটের উৎপাদন সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়াও তাপসহিষ্ণু গবাদি পশু লালন-পালন, মিঠা ও লবণাক্ত পানিতে উৎপাদন উপযোগী মৎস্য লালন-পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কৃষিঋণ সম্প্রসারণ গতিশীলতা লাভ করেছে। এক সময় শুধু বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষিঋণ প্রদান করত, এখন বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রদানে এগিয়ে এসেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ১১৯০ সাল হতে কাজ করছে। বর্তমানে পিকেএসএফ এর কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিকেএসএফ এর নিকটও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত বিশেষ স্থান পেয়েছে। তাই পিকেএসএফ তার সকল কার্যক্রমে, বিশেষ করে কৃষিঋণ কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এ অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার অনেক কৃষক ইতোমধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত ব্রিধান-৪১ আমন মৌসুমে এবং ব্রিধান-৪৭ বোরো মৌসুমে চাষ শুরু করেছে। এ অঞ্চলের কৃষকরা কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জাতের আগাম পাট চাষ শুরু করেছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলের জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। ফলে বেশির ভাগ কৃষক ধান চাষ করতে পারছিল না। বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, বর্তমানে এ অঞ্চলের উপকূলবর্তী কৃষকরা বোরো মৌসুমে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৫ চাষ করছে। "বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)" সম্প্রতি বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার কৃষকদের জন্য বিনা ধান-৮ নামে বোরো ধান নিয়ে এসেছে, যা ইতোমধ্যে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এসকল ধান চাষ বিস্তারে পিকেএসএফ-এর সহযোগী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা সবসময়ে আকস্মিক বন্যার ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। বন্যাসহিষ্ণু ধান ব্রিধান-৫১ এবং ব্রিধান-৫২ ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের কৃষক কর্তৃক পরীক্ষিত। দ্রুত বর্ধনশীল আগাম ধান ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯ এবং বিনাধান-৭ মঙ্গা পীড়িত এলাকার কৃষকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ব্রিধান ৪২ ও ৫৭ ধান খরা মৌসুমে কৃষকদের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রেখে কৃষকরা বর্তমানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতের আলু চাষ করছে। পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ আবহাওয়ার সাথে খাপ-খাওয়ানো এসকল ফসলের তথ্য কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বছর জুড়ে সবজি চাষ বিশেষ করে সারা বছর ব্যাপী টমেটো উৎপাদন এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক সংগঠিত কৃষকরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেদেরকে খাপ-খাওয়ানোর পাশাপাশি নিজেদের সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পিকেএসএফ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য Community Climate Change Project (CCCP) নামে চার বছর মেয়াদি প্রকল্প শুরু করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল- জলবায়ু ঝুঁকিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে কার্যকর ভাবে সাড়া দেয়ার জন্য টেকসই অভিযোজন চর্চা প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে সংগঠিত কৃষকগণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্বিপাক মোকাবেলায় আরো সক্ষম হয়ে উঠবে। এই প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পিকেএসএফ পরিচালিত কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। কৃষি খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে সার্বক্ষণিক প্রায়োগিক গবেষণা এবং খাপ- খাওয়ানোর কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতার সাথে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনও দ্রুততার সাথে করতে হবে। দ্রুততম সময়ের ভিতর নতুন কৃষি প্রযুক্তির সাথে কৃষকদের পরিচয় ও ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে । কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সরকারী বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষিঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় বাড়াতে হবে।

মুহম্মদ হাসান খালেদ
মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

তপন কুমার দাশ

লুণ্ঠিত জলাধার: লোনা জলের পদধ্বনি

প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে পানি। জীবের উৎপত্তি, লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে পানিই হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয়- যা আগে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতারই উত্থান-পতনের কেন্দ্রমূলে ছিল পানির ভূমিকা। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসিরীয় কিংবা সিন্ধু সভ্যতা, সবই গড়ে উঠেছে টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু কিংবা নীল নামক সুনির্দিষ্ট কিছু জলাধারকে কেন্দ্র করে। প্রখ্যাত পানি বিজ্ঞানী সান্দ্রা পাটিল বিষয়টি তাঁর বিখ্যাত *পিলার অব স্যান্ড* নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে, “পানি সম্পর্কে কিছু না বলে মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলা অসম্ভব এবং যখনই পানির বিষয় এসেছে, প্রকৃতি তা জটিল হাতেই নাড়াচাড়া করেছে।”

পানিকেন্দ্রিক যে কোনো আলোচনায়ই বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি সম্ভবত একটি নাজুক অধ্যায়ের সূচনা করবে। কারণ, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রসহ কমবেশি প্রায় সাত শত নদ-নদীর আশীর্বাদপুষ্ট। মৌসুমে এত পানি পৃথিবীর আর কোনো দেশ পায় কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। আবার এই ভূখণ্ডেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পানির অপচয় ও দূষণ ঘটে। বছরের অর্ধেক সময়েই এদেশে পানির জন্য থাকে হাহাকার। এক কলস পানির জন্য মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে রাত দিন। পানির জন্য এখানে মিছিল হয়, আন্দোলন হয়, অথচ এই বাংলাদেশ পুরোটাই ধরতে গেলে এক জলাভূমি। বর্ষাকালে বাংলাদেশের জল থৈ-থৈ রূপ নিয়ে তৈরি হয়েছে কত কাব্যগাথা।

রামসার কনভেনশন-এর সংজ্ঞা অনুসারে এদেশের ৭ ভাগ ভূমি মতান্তরে ১১ শতাংশ সর্বদাই জলমগ্ন থাকে। (সূত্র: বাংলাদেশ পরিবেশ চিত্র ১৪০৬) এখানকার হাওর-বাওর, বিল-ঝিল, নদী-নালা, পুকুর-ডোবা, খাদা-খন্দ সর্বত্রই শুধু পানি আর পানি।

এশিয়ান জলাভূমি নির্দেশিকার তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে স্থায়ী নদী ও ঝরনার অবস্থান প্রায় ৪৮০ হাজার হেক্টর জুড়ে, নদীর মোহনা ও ম্যানগ্রোভ জলাভূমির পরিমাণ প্রায় ৬১০ হাজার হেক্টর, অগভীর হ্রদ, বিল ও হাওর প্রায় ১২০-২৯০ হাজার হেক্টর, ছোট্ট পুকুর ও ডোবা ১৫০-১৮০ হাজার হেক্টর, চিংড়ি ঘের ৯০-১১৫ হাজার হেক্টর, বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল প্রায় ৫,৭৭০ হাজার হেক্টর এবং বৃহৎ পানি সংরক্ষণাগার রয়েছে ২১০ হাজার হেক্টর জুড়ে। এসব কিছু মিলিয়ে এবং উপকূলীয় জলমগ্ন অঞ্চল মিলিয়ে দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকাকে ধরা হয় জলাভূমি। (সূত্র: *পরিবেশ কথকতা*, পৃষ্ঠা-১৯) কিন্তু এসব জলাভূমিতে শুধু যে পানি রয়েছে তা নয়, সমগ্র জলাভূমি জুড়ে রয়েছে বিশাল সম্পদের ভান্ডার। এক কথায় যাকে বলে জলজ সম্পদ। বাংলাদেশে শুধুমাত্র জলজ সম্পদকে উপজীব্য করেই বেঁচে থাকে কয়েক কোটি মানুষ। এসব জলাভূমি জীববৈচিত্র্যের খনি বিশেষ এবং এখানে রয়েছে স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল।

জলাভূমির প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা বলে শেষ করা যায় না প্রথমত, জলাভূমি মানুষকে পানি সরবরাহ করে, কখনও উপরিভাগে কখনও ভূগর্ভে। দ্বিতীয়ত, পানি সংস্করণ ও নিষ্কাশন, ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধ, পলিমাটি সরবরাহ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, নৌ চলাচল, খাদ্য সরবরাহ, জ্বালানি, পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি কত ক্ষেত্রে যে জলাভূমির ব্যবহার রয়েছে তার কোনো হিসেব নেই।

কোনো কোনো গবেষকের মতে ২৫০ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর প্রায় সম্পূর্ণ অংশই জলমগ্ন ছিল এবং প্রায় ১০০ ডিগ্রি

সেলসিয়াস উত্তাপ নিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ কেবলই ফুঁসছিল। নানা কারণেই এখানে সেখানে ক্রমাগতভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল ভূ-পৃষ্ঠ, সৃষ্টি হচ্ছিল ছোট বড় ফাটল। ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এ সঞ্চালনের মাত্রা ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে অনেক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। কারো কারো মতে, এ সকল আগ্নেয়গিরির লাভাসমূহ শীতল হয়ে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়ে ক্রমান্বয়ে ডাঙ্গা সৃষ্টি করে। এখন থেকে দুইশ কোটি বছর আগে ধীরে ধীরে জলাশয়ের বুকেই সৃষ্টি হয় স্থলভাগ। বৃহদাকার স্থলভাগ মিলেই গঠিত হয় এক একটি মহাদেশ। মহাদেশের নদ-নদী নিয়েই তখন মহাদেশগুলো ছুটাছুটি করতে থাকে এদিক থেকে সেদিকে। ফলে ক্রমাগতভাবে নদ-নদীর আকার, আকৃতি ও গতিপথ পরিবর্তন হতে থাকে এবং কোনো কোনো নদী মহাদেশগুলোকে বিদীর্ণ করে ছুটে যায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

গবেষকদের মতে, এই ভারতবর্ষ একসময় ছিল অস্ট্রেলিয়ার খুব কাছে, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া ছিল এই ভূ-খণ্ডের পাশেই। কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষ চলে এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়েক হাজার মাইল উত্তর-পশ্চিমে। প্রায় চার কোটি বছর আগে ভারতবর্ষে এসে মঙ্গোলীয় ভূ-খণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা দিতে শুরু করে এবং এ প্রবল ধাক্কার কারণেই হিমালয় সৃষ্টি হয়। আর হিমালয়ের থেকেই সৃষ্টি হয় অসংখ্য নদ-নদী।

কিন্তু সমস্যা হলো বাংলাদেশে এই জলাভূমির পরিমাণ দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ফারাক্কার প্রভাবে প্রায় শুকিয়েই গেছে পদ্মা ও এর শাখানদীগুলো। ধরলা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীরও যায় যায় দশা। টিপাইমুখ বাঁধ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মেঘনার কি হবে বলা যায় না। ভারতের আন্তঃ রাষ্ট্রীয় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জলাশয়গুলোর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

অপরদিকে, দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে ভয়ঙ্কর আগ্রাসন। বাংলাদেশ ভূখণ্ড দিয়ে প্রবাহিত তের চৌদ্দ শত নদীর মধ্যে এখন বেঁচে আছে মাত্র দু'শ আড়াইশতটি। তার মধ্যে আবার দেড় শত-র অবস্থা যায় যায়। পদ্মা, মেঘনার মৃত্যু ঘটলে তার শোকেই মারা যাবে প্রায় দুই শত নদী। এরই মধ্যে এসব স্থানে লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে হিংস্র দখলবাজদের। ইতোমধ্যেই ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে তুরাগ, বালু, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যাসহ শহর ঘেঁষা নদীগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকা। জনাব কামরুল ইসলাম তার 'বাংলাদেশ: পরিবেশ পরিচিতি' প্রবন্ধে লিখেছেন-'তাই শুধু প্রতিবেশ নয় অর্থনৈতিকভাবেও এসব জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্যের আধার ছাড়াও এসব জলাভূমি বন্যার পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে, অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানি মাছ চাষের সুবিধা দেয় এবং নৌ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষির প্রসার ঘটায় এসব জলাভূমির অনেকগুলোই হয় একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নয় সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এ ধরনের একটি অবক্ষয় জীববৈচিত্র্যের ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে মাছের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং দেশের বেশ ক'টি বন্যাপ্রবণ সমতলভূমি আরো বেশি মাত্রায় বন্যাপ্রবণ হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর কোথাও এমন না হলেও আমরা আমাদের শহর-বন্দরের যত আবর্জনা, মলমূত্র সব নিক্ষেপ করি নদীতে। শুধু বুড়িগঙ্গাতেই প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে শত শত টন বর্জ্য। একই অবস্থা বালু, তুরাগ আর শীতলক্ষ্যায়। সকলের চোখের সামনেই প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন পাথর ফেলে দিয়ে শীতলক্ষ্যাকে হত্যা করা হচ্ছে। দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে কর্ণফুলি, ভৈরব কিংবা ধলেশ্বরীর মতো নদীতেও। শুধুমাত্র কর্ণফুলি নদীতেই ১৪৪টি কলকারখানার হাজার হাজার কেজি বর্জ্য ফেলা হচ্ছে প্রতিদিন। সারা পৃথিবীর নদীগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নদীগুলোর দূষণ সবচেয়ে বেশি। এগুলোর কোনোটির দূষণের মাত্রা অন্য কোনো দেশের দূষিত নদীর চেয়ে দশ গুণ বেশি।

জলাশয় দূষণের উপাদানসমূহ

- শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ
- গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা
- পয়ঃনিষ্কাশিত ময়লা
- বৃষ্টিতে ধুয়ে আসা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক
- জাহাজ ও অন্যান্য নৌযান থেকে নির্গত তেল
- পরিষ্কারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি
- পারমাণবিক চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নির্গমন ইত্যাদি।

নদ-নদীতে বাঁধ দেয়া নদী ধ্বংসের আর এক কারণ। এক সময় ভারতবর্ষে বলা হতো 'বাঁধগুলো হলো মন্দির'। সুতরাং দেখতে দেখতে সারা ভারতে তৈরি হলো ছোট বড় সাড়ে চার হাজার বাঁধ। শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণেই ভারত সরকার ব্যয় করল প্রায় দুইশত হাজার কোটি টাকা। শুধু ভারতে কেন, আসিয়ান বাঁধ বাঁধতে গিয়ে ফতুর হয়ে গেল মিশর। এক সময় জড়িয়ে পড়ল ইসরায়েলের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধে। শুধুমাত্র পানি আটকে রাখা নিয়ে সারা পৃথিবীতে সংগঠিত হয়েছে শত শত ভয়াবহ যুদ্ধ।

আমাদের দেশেও বাঁধের সংখ্যা অগণিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে কত নদীর গতিধারা রুদ্ধ হয়েছে বাঁধের মাধ্যমে তার কোনো ইয়ত্তা নাই। এদেশের বাঁধগুলোর মধ্যে তিস্তা বাঁধ, মুহুরী বাঁধ, কাপ্তাই বাঁধ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় এক শ্রেণীর মানুষের লাভ হয়েছে বটে, তবে এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।

নদীর সঙ্গে মানুষের জীবনের রয়েছে চমৎকার মিল। মানুষের জীবনের যেমন তিনটি অধ্যায়, শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। নদীর

তেমনি সব কিছুরই আরম্ভ যেমন আছে শেষও তেমনি আছে। তবে বাংলাদেশে সব নদীর বার্ধক্য আসল একসাথে এবং বর্তমান শতাব্দীতে। এটাই আমাদের দুঃখ। আমাদেরকেই হতে হলো নদী হত্যাকারী। এজন্য শুধু যে আমরা দায়ী তা কিন্তু নয়। দায়ী আমাদের পাশের বৃহৎ দেশগুলোও। নদীর পানি নিয়ে কাঙ্গালপনা ও হিংসা তাদের আর গেল না। "বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও" কিংবা "এসো হে তৃষ্ণার জল কলকল, ছলছল" কবিগুরুর এসব আহ্বানকে তুচ্ছ করে তারা আটকে ফেলল নদীগুলোকে। চীন তো চাইছে আণবিক শক্তি ব্যবহার করে তারা ব্রহ্মপুত্রকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য করবে। তাহলে নদী আর বাঁচবে কী করে?

ইতোমধ্যেই দেশের অনেকগুলো ছোট ছোট নদী মানুষ বেঁধে ফেলছে। ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে গেছে। বাকিগুলোও দখল করার পাঁয়তারা চলছে। যারা এসব করছে তারা যে অনেক ক্ষমতার অধিকারী। তাদের বিরুদ্ধে কেই বা কী করবে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব জলাশয় না থাকলে বাংলাদেশে পানি আসবে কোথা হতে? বলা বাহুল্য, বৃষ্টি ও বন্যার পানি আমাদেরকে ভাসিয়ে অথবা ডুবিয়ে দিয়ে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মধ্যেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। সে থেকে এপ্রিল-মে পর্যন্ত দেখা দেয় পানির আকাল। তখন সর্বক্ষেত্রেই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর। বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ সেচ কার্যক্রম চালানো হয় ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে। শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই ভূ-গর্ভের পানি ব্যবহার হয় দৈনিক প্রায় ১৮০ কোটি লিটার। ফলে, গত এক দশকে এখানকার পানির স্তর প্রায় ২০ মিটার নিচে নেমে গেছে এবং গিয়ে পৌঁছেছে প্রাপ্তির শেষ সীমানায়। সারা দেশের চিত্র একই রকম। উত্তরাঞ্চলে প্রতি বছরই পানির স্তর কমপক্ষে দেড় ফুট করে নিচে নেমে যাচ্ছে।

ততোধিক নাজুক এদেশের পুকুর-ডোবা, হাওর-বাঁওর বা বিল-ঝিলগুলোর অবস্থা। এগুলো রক্ষার জন্য যতটা ঢাক ঢোল পেটানো হয় ততটা উদ্যোগ নেওয়া হয় না। সকল আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতিকে উপেক্ষা করে এসব কিছুই দখলে চলে যাচ্ছে দুর্বৃত্তদের। মরে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে জলাশয়গুলো। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হারিয়ে যেতে চলেছে এদেশের জীববৈচিত্র্য। গবেষকদের মতে, এরই মধ্যে এদেশ থেকে এমন কি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের উপর।

তদুপরি, যতটুকুই পানি শুকনো মৌসুমে ভূ-উপবিভাগে অবশিষ্ট থাকে তা হয়ে যায় ব্যবহারের অযোগ্য। শোধনহীন বর্জ্য, শিল্পজাত বর্জ্য, কৃষিভূমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, কাঁচা পয়ঃব্যবস্থা, লবণাক্ততা ইত্যাদি কারণে সমুদয় পানি সম্পদই হয়ে গেছে বিষাক্ত।

সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হল, এ অবস্থা চলতে থাকলে হয়ত আমাদেরকে বাধ্য হয়েই গুণ ও মানহীন বোতলের পানির উপরেই নির্ভরশীল হয়ে যেতে হবে পুরোপুরি। এমন কি নিত্য ব্যবহার্য পানিও আমাদের কৌটা বা বিষাক্ত পলিথিন ভরে কিনে আনতে হবে। পানি আমদানি করতে হবে বিদেশ থেকে।

"বাংলাদেশ ২০২০ এর পারস্পেকটিভ স্টাডি" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ২০২০ সালে পানির মোট চাহিদা হতে পারে ২৪.৩৭০ মিলিয়ন লিটার। তখন প্রায় ১০০০ মিলিয়ন লিটার পানির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে ২০২০ সালে যে পরিমাণ চাষাবাদের পরিকল্পনা গৃহীত হবে, শুধুমাত্র সেচ ব্যবস্থার অভাবেই তা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উষ্ণতার প্রভাব এর সঙ্গে যোগ করবে নতুন মাত্রা। যদি আমরা সচেতন না হই, যদি পানির অপচয় ও দূষণ কমিয়ে আনতে না পারি, যদি নদ-নদীকে দখলমুক্ত রাখতে না পারি, তবে শুধুমাত্র পানি নিয়েই বাংলাদেশে এনায়েত উল্লাহ্ খান তাঁর 'পানি ও পরিবেশ' প্রবন্ধে লিখেছেন-ইতিহাস অনেক সভ্যতারই উত্থান-পতনের সাক্ষী। যেমন সুমেরীয়, ব্যবিলনীয় ও এ্যাসিরীয়। এসব সভ্যতা একসময় গড়ে উঠেছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের অববাহিকায়, নীল নদের তীরে, সিন্ধু ও পীত নদীর তীর জুড়ে। ইতিহাস পানি যুদ্ধের আলামত প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যক্ষ করেছে পানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের। পানিই ৫০০০ বছর ধরে মানব ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। প্রাচীন গল্পগাথা, উপকথা, পবিত্র গ্রন্থসমূহের বাণী ও ঐতিহাসিক রেকর্ডে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনায় পানির ভূমিকার মনোগ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালেও আমাদের এই দেশে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন বিতর্ক তেমনই এক দৃষ্টান্ত। যে হাহাকার উঠবে তা সামাল দেওয়া হবে সত্যিই কঠিন।

আমার তো মনে হয় এ শতকের শেষের দিকে এদেশে আর একটি নদীও বেঁচে থাকবে না। তাহলে তখন আমাদের কী হবে? এতোগুলো নদী হত্যার প্রতিশোধ কী কেউ নেবে না? নিশ্চয়ই তখন মহাপ্রতাপশালী সাগর এগিয়ে আসবে আমাদের দিকে। লোনা জলের পদধ্বনি তো শোনাই যাচ্ছে। সতর্ক সংকেত তো প্রতিনিয়তই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করে কে?

এই ইস্যুকে সামনে রেখেই সারা পৃথিবীতে এ বছর পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৪। আমাদের দেশেও তা পালন করছি। আশা করি, এসব আলোচনা শুধুমাত্র দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাস্তবায়িত হবে আন্তরিকতার সঙ্গেই। তাতেই আমাদের মঙ্গল।

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

ড. ওবায়দুল করিম

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন: আমাদের করণীয়

দুর্যোগ একটি এথনোসেন্ট্রিক (Ethnocentric) বা মানব স্বার্থ-কেন্দ্রিক ধারণা। প্রাকৃতিক কোন পরিবর্তন তা আকস্মিক বা ধীরগতিতেই হোক; মানুষের অস্তিত্ব, দৈহিক বা সামাজিক যাই হোক, তা যদি সমূহ ক্ষতির কারণ হয় তাহলে তাকে দুর্যোগ বলে থাকি। দুর্যোগ দুটো শর্তের অধীন। এগুলো হলো (১) প্রকৃতির পরিবর্তন যা মানব অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ ও (২) সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনের তাগিদ থেকে প্রকৃতির উপর অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হওয়া। আমাদের প্রকৃতি কয়েকটি মণ্ডলের (Spheres) সম্পর্কের আধার। বারিমণ্ডল (Hydrosphere), মৃত্তিকা মণ্ডল (Lithosphere), বায়ুমণ্ডল (Atonesphere), জীব মণ্ডল (Biasphere) ইত্যাদি। এই মণ্ডলগুলো একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরস্পরের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত।

মানুষ জীবমণ্ডলের অংশ। মানুষ তাঁর জীবন ও জীবিকার জন্য অন্য মণ্ডলের উপর নির্ভরশীল। যতদিন প্রকৃতির অধীন ছিলো মানুষ, ততদিন সে ছিলো প্রাণী জগতের অন্য সব প্রাণীর মতই খাদ্য সংগ্রহকারী (Food Gatherer)। এই সময়কাল পর্যন্ত মণ্ডলগুলোর সম্পর্ক ছিলো সুষম (Balanced)। মানুষ যখন খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হয়, তখন থেকে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগমণ শুরু হয়। মানুষ কৃষি ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তোলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হয়ে ওঠে প্রকৃতিকে পরিবর্তনের হাতিয়ার। প্রকৃতিকে পরিবর্তন না করে মানুষ তাঁর সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রিয়া বাড়তে থাকে কালে কালে। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, শিল্পবিপ্লব প্রকৃতির 'প্রাকৃতিক ধারণা'টাকেই বদলে দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এখন সামাজিক পরিবেশের অধীন। পুঁজিবাদ, শিল্প সমাজের উদ্ভব না ঘটলে গ্রীন হাউজ এফেক্ট (Green House Effect), এসিড বৃষ্টি (Acid Rain), মরুকরণ (Deforestation) ইত্যাদি নেতিবাচক প্রভাবগুলো অস্তিত্বমান হতো না। আবার বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন না হলে সমস্যাগুলোর আন্তর্জাতিক চরিত্র থাকত না। দুর্যোগ তাই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশসঞ্জাত। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে মানুষ, প্রকৃতির সাথে অভিযোজন নয় বরং মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। ফলে উল্লিখিত বিভিন্ন মণ্ডলগুলোর ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের 'প্রাকৃতিক' কারণ ছাড়াও দুর্যোগের সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে, মানুষের অতি ক্রিয়াশীলতার প্রভাবে। এবং এই কারণে দুর্যোগ প্রশমনের প্রাকৃতিক কারণের সাথে সামাজিক কারণগুলোও অপনোদন করা প্রয়োজন। দুর্যোগ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। এমনিতে মানুষের ক্ষতির কারণ হয় না, এমন প্রাকৃতিক ঘটনাকে দুর্যোগ বলা যায় না। তাহলে বৃহদাকার ডাইনোসরের অবলুপ্তি কি 'দুর্যোগ' ছিলো? বলা হয়, যদি তা মণ্ডলসমূহের ভারসাম্য নষ্ট করে থাকে, তবে অবশ্যই তা দুর্যোগ বলে বিবেচিত হবে। কেননা এতে জীবমণ্ডলের অংশ হিসেবে মানুষের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বাংলাদেশ একটি ট্রপিকাল বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ। সভ্যতা

নির্মাণে এ অঞ্চল যেমন উপযোগী এবং এ কারণে এই অঞ্চলগুলোতে সভ্যতার সৃজন হয়েছিলো, ঠিক তেমনি ভূমণ্ডলীয় প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশী দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবেও এ অঞ্চল পরিচিত। ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা এ অঞ্চলের অতি পরিচিত দুর্যোগ। এছাড়া মানব আবাস বন্টনে (Human Ecology) এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে মানুষের কনসেনট্রেশন বা কেন্দ্রীভবন খুবই বেশী। ফলে এ এলাকার দুর্যোগে যদি সামাজিক ব্যবস্থা দারিদ্র্যপীড়িত হয়, তবে ক্ষতির পরিমাণ হয় গুরুতর।

এছাড়া এ অঞ্চলের বিশাল অংশ জুড়ে টেকটোনিক ফল্ট বা চ্যুতির (Tectonic Fault) অবস্থান হওয়াতে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবেও এ অঞ্চল পরিচিত। এছাড়া মানুষের বিশেষ করে উন্নত ধনী দেশগুলোর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসের নিঃসরণে ও অতিশয় ভূমিকায় পরিবেশে পরিবর্তন ও দুর্যোগের এক নয়া মাত্রা তৈরি করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিবেশ এলাকা শিফটিং (Shifting) যা এল নিনো ও লা নিনা বলে পরিচিত তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়া পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। আর এসব পরিবর্তনের চেইন এফেক্ট (Chain Affect) হচ্ছে দুর্যোগ। দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ এবং প্রশমনের উপায়ও হচ্ছে বহুবিধ। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মত, দুর্যোগের ক্রমবৃদ্ধিও একটি সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুষ্টচক্রের অধীন হয়ে পড়েছে। মানুষ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে কাজ করে, প্রকৃতিকে বদলায় এবং সাথে সাথে নিজেকেও। মানুষের প্রয়োজনে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানুষ প্রকৃতিকে বদলালেও, বদলালো সাথে সাথে নিজেকেও। পৃথিবীতে সাত শত কোটি জনসংখ্যার বর্তমান অস্তিত্ব প্রকৃতিকে বদলানোরই ফল।

প্রকৃতিকে, প্রাকৃতিক (Natural) অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার প্রযুক্তির প্রয়োগে প্রকৃতির আরো অসম অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশাল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে মানুষ। তার সম্পূর্ণ বিলোপ নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব নয়, তবে প্রশমনের প্রচেষ্টা আছে, আর সে দিকটাই উল্লেখ ও প্রয়োগের দাবি রাখে। দুর্যোগের প্রশমন করা যায় দু'ভাবে। এক এর প্রতিকার করে এবং অন্যটি দুর্যোগের কারণ অপনোদন করে। দ্বিতীয়টি দীর্ঘ মেয়াদি এবং কষ্টসাধ্য। প্রথমটি আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে পরিজ্ঞাত। দ্বিতীয়টি, প্রকৃতি, পরিবেশ, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সংস্কারের সাথে জড়িত। দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের বা কমানোর বিষয়টি আপৎকালীন ও তাৎক্ষণিক বিষয় হিসেবে গণ্য হলেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও বিবেচনায় নিতে হবে।

বাংলাদেশ নিরীক্ষিয় অঞ্চলের দেশ হওয়ায় সাইক্লোন, কালবৈশাখী এবং ভারতীয়, ইউরেশীয় ও বার্মা প্লেটের চ্যুতির কাছে অবস্থান হওয়াতে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। প্রতি মাসেই বহুবার সংঘর্ষ হয় এই দুই প্লেটের মাঝে এবং এর ফলে কম্পনও অনুভূত হয়। তবে তার মাত্রা অনেক সময় কম হওয়াতে সকল সময়েই অনুভূত হয় না। প্লেট সমূহের সংঘর্ষ ও কম্পন এক বিশাল শক্তির আধার হয়ে উঠছে, যা এক বিশাল ভূমিকম্পনের জন্ম দিতে পারে। এমনই যদি হয়, তাহলে দুর্যোগ উত্তরণে জনগণের কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের কিছুটা জানা আছে।

সাইক্লোনের সংকেত প্রদানকালীন সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য, কমিউনিটি রেডিও, সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয়গ্রহণ, মুড়ি, চিড়াসহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খাবারের আপৎকালীন বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার প্রয়োগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কমানো গেছে। ১৯৭০ এর প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড় ও সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সিডর-এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করলে বোঝা যায়। দুর্যোগের পরের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আমরা কিছুটা কমাতে পেরেছি। আমাদের দেশের নগরবাসীর জন্য সম্ভাব্য ভূমিকম্পনের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর অসচেতনতা ও দুর্যোগোত্তর সেবা বৃদ্ধির ঘটনা এখনও অনুমাননির্ভর। ভূমিকম্পনের মতো দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর বিষয় জনসচেতনতার সাথে সাথে আইনের প্রয়োগ-নির্ভর। বিল্ডিং কোড না মেনে গড়ে ওঠা শহরের দালান-কোঠার অবকাঠামো ৬ এর উপর রিখটার স্কেল মাত্রার কম্পন কতটুকু সহ্য করতে পারবে তা অনুমেয়। এখানে ঝুঁকি কমানোর বিষয়টি সামাজিক-রাজনৈতিক শুধুমাত্র জনসচেতনার ওপর নির্ভরশীল নয়। দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর তাৎক্ষণিক বা আপৎকালীন পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হলেও, ঝুঁকি প্রশমনের সামাজিক-অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হচ্ছে না।

দুর্যোগকে আমরা যেভাবে সংজ্ঞায়িত করি, সেখানেও আছে সংরক্ষণবাদী মনোভাব। দুর্যোগের সমকালীন ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদিকে সাধারণত বোঝানো হয়। কিন্তু প্রযুক্তির অহরহ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যে যে ক্ষতিকর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে, তা দুর্যোগ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি।

যেমন, কম্পিউটারনির্ভর মানবসমাজের পুনঃ পুনঃ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে রিপিটেটিভ স্ট্রেস ইনজুরি (Repetitive Stress Injury) বা কার্পেল টানেল সিনড্রোম (Carpal Tunnel Syndrome)-এর মত মারাত্মক মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিশাল মানব সমাজ বা সম্পদ

যখন অসুস্থ বা উৎপাদক হিসেবে অনুপযোগী হয়ে পড়ে তখন তা অবশ্যই এক বিশালকার দুর্যোগ হিসেবেই চিহ্নিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশকে একটি পেপারলেস সোসাইটি (Paperless Society) তে উৎক্রমণ ঘটাবে, যা সামাজিক-অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংস্কারের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আর এ সম্ভাব্য দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় এক্ষুণি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের বিষয়টি একটি মৌলিক বিষয়, যা উপেক্ষিত থেকেছে বিভিন্ন সময়ে। বর্ষাকালে ঢাকা শহর প্লাবিত হওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিক কালের। এর কারণও অনেকটা সামাজিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ দরিদ্র হওয়াতে জ্বালানির উৎস হিসেবে লাকড়ি ব্যবহারে বাধ্য হয়। গ্রামাঞ্চলে বন উজাড়ের (Deforestation) ঘটনাও একটি কারণ। গাছপালা কমে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিপাতেই নদী-খালের তলানি ভরতে থাকে। উপচে পড়ে পানি। শুরু হয় বন্যার তাণ্ডব। বন্যা হলে তার তাৎক্ষণিক ঝুঁকি মোকাবেলা আমরা হরহামেশাই করছি। অপরিকল্পিত ঢাকা নগরের বিকাশ জলাবদ্ধতার সমস্যা তৈরি করেছে। বন্যা তারই ফল। আইনী সংস্কার ও এর প্রয়োগ সামাজিক সংস্কারেরই অংশ। বন্যা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নয়; সামাজিক দুর্যোগও বটে। সুতরাং এই দুর্যোগের সামাজিক কারণের অপনোদন হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য রয়েছে। উন্নত দেশগুলো মূলত মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজ। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন উন্নত হওয়ারজন্য একটি শর্ত। আর উন্নত হওয়ার সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য সমস্যা এমনকি দুর্যোগও কমে আসতে থাকে। জাপানে সাম্প্রতিক কালের ভূমিকম্পের ব্যাপক ক্ষতির পরও জাপানের অর্থনীতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। এর চেয়ে অনেক কম মাত্রার ভূমিকম্প ঘটলে আমাদের অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে অনেক বছর লেগে যাবে। এর কারণও সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের পার্থক্য। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন, দুর্যোগের ঝুঁকির মোকাবেলায় অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন।

সারা পৃথিবীর অসম অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবেশ দূষণ ও দুর্যোগের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কার্বন ডাই অক্সাইডের উদগীরণকে (emission) নব্বই সালের পূর্বে নিয়ে যাওয়ার দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করেছিলো অনেক আগেই। উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসছে, এইটি সবারই জ্ঞাত। বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের দুর্যোগকে আরো ব্যাপক করছে। নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্যোগকে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসতে পারে।

প্রফেসর ড. ওবায়দুল করিম দুলাল
অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[চট্টগ্রামে ২৪ মে ২০১২ তারিখে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।]

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া

গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং অর্থনীতি

বর্তমান বিশ্বের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ দারিদ্র্য। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার উপরে বাস করে। তারাই ভোগ করে গ্রামীণ আয়ের ৬০ শতাংশ। বিপরীতে ৮০ শতাংশ লোক বাস করে দারিদ্র্য সীমার নিচে। গ্রামের ৬০ ভাগের বেশি লোকই ভুমিহীন। কখনো তারা সস্তা মজুর, কখনো বেকার। গ্রামের এই আয় বৈষম্যের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে, ভূমি মালিকানা বৈষম্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, মজুরী কম, সরকারি কর্মসূচির বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি।

বিগত ৭০ বছরের উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এখানে প্রত্যাশিত জীবনকাল বেড়েছে ৬০%। শিশু মৃত্যুর হার, অর্ধেকেরও কর্ম, স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের অনুপাত অর্ধেকেরও কম থেকে চার পঞ্চমাংশের উপরে দাঁড়িয়েছে। যদিও জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে যা অর্জনে, যুক্তরাষ্ট্রের লেগেছিল ৩৮ বছর (১৯১৩-৫১), কানাডার ৪২ বছর (১৯১৩-৫৫) এবং যুক্তরাজ্যের লেগেছিল ৬০ বছর (১৭৮০-১৮৪০) এবং এই সময়টা ছিল তাদের শিল্প উত্থানের কাল। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, গত কয়েক দশকের যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সময়কালের চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মৃত্যু, আয় বৈষম্য প্রভৃতি সমস্যা অনেক বেশি প্রকট ও প্রত্যক্ষ। দারিদ্র্য সীমারেখা হচ্ছে একজন মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মত আয় বা উপার্জন। এর পরই রয়েছে চরম দারিদ্র্যাবস্থা যার অর্থ, এমন অবস্থা, যখন প্রতিদিনকার গড় ক্যালোরী গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ৮০ শতাংশের নিচে থাকে এবং তারা ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। চরম দারিদ্র্য অবস্থার নিচেই রয়েছে, দুর্ভিক্ষ এবং অনাহার। এ অবস্থান খুবই বিপজ্জনক। কারণ সামান্য খাদ্য ঘাটতি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেশকে দুর্ভিক্ষ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে।

গ্রাম এলাকায় ৭০% শতাংশ পরিবার নূন্যতম প্রয়োজনের চাইতে কম ক্যালোরী পাচ্ছে। ৮০% শতাংশ লোক রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে। গ্রাম অঞ্চলের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে ভুমিহীনতা, বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে বিত্তবানরা জমি, সম্পদ কুক্ষিগত করছে।

আজ গ্রামীণ দারিদ্র্যই বাংলাদেশের মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে। বেতন দিয়ে, কর্মসংস্থান করে এই দারিদ্র্য হটানো সম্ভব নয়। এই দারিদ্র্য নিরসন করতে হলে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথে যেতে হবে। এ দেশে কি সরকারি, কি বেসরকারি সর্বত্রই এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক রয়েছে। সেখানে আর কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। এখন শুধু প্রয়োজন আত্ম-কর্মসংস্থানের জরুরি আয়োজন। একটা কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে, দারিদ্র্য দরিদ্রদের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। এর সৃষ্টি হয়েছে, যারা দরিদ্র নয় তাদের দ্বারা। ক্ষমতাবানেরা যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনা করেছে, যে সব নীতি রচনা করেছে, তার মাধ্যমেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছে। দরিদ্রদের দরিদ্র করে রাখার জন্য, তাদের চারিদিকে বহু প্রাতিষ্ঠানিক মজবুত দেয়াল তৈরি করা হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের অবস্থান থেকে বের করে আনতে হলে, এই প্রতিষ্ঠানিক দেওয়াল ভাঙ্গতে হবে। আজ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক বেকার। তাই সনাতন চিন্তা পরিহার করে, এর বাহিরে আমাদের পথ খোঁজতে হবে। আত্ম-কর্মসংস্থান ছাড়া আমাদের মুক্তি নাই। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা উন্নয়ন দর্শন থাকা প্রয়োজন। প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গরিবদের জন্য কিছু করতে হলে, বলতে হবে, দারিদ্র্যের জন্য স্বাস্থ্য, দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষা, দারিদ্র্যের জন্য উন্নয়ন, যে প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচন করে। আমরা কেবল মাত্র সেই প্রবৃদ্ধিকেই গ্রহণ করব। তার জন্য শ্রম, মেধা ও সম্পদ বিনিয়োগ করবো। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার আগে, যে জিনিসটি সর্বাগ্রে বিবেচ্য, সেটি হচ্ছে কত আন্তরিকতার সাথে আমরা দারিদ্র্য নির্মুল করতে চাই।

অর্থনীতিবিদগণের মতে, দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগত কাঠামোতে দুটি বিষয় প্রধান আবশ্যক- ১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) এবং ২. জনখাতে বিনিয়োগ (Investment in People) এই দুইটি উপাদান পরস্পরের সহায়ক ছাড়া অপরটি কার্যকর নয়। WDR-90-তে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এদের একটি ছাড়া অপরটি কার্যকর নয়। অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া কোন দারিদ্র্য দূরীকরণ সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে শুধু প্রবৃদ্ধির হারই নয়। এর ধরনও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রম নিফবড় উৎপাদন কার্যক্রমে দরিদ্ররাই মূল সম্পদ, অর্থাৎ তারা শ্রমের ব্যহারের সুযোগ পায়। এতে করে কর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যদের আয় বাড়ে।

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং সেফটি নেটস (Targeting and Safety Nets) ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যয়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অপরিহার্য, তবে এটিই যথেষ্ট নয়। এ সমস্ত ব্যয়ের কার্যকারিতা ও সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অতীব জরুরি। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো মৌলিক সেবামূলক খাতসমূহে ব্যাপক লক্ষ্যমাত্রা থেকে দরিদ্ররা বেশি উপকৃত এবং লাভবান হয়েছে। তুলনামূলকভাবে সীমিত প্রকল্প অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর জন্য গৃহীত হতে পারে। এ সবের মধ্যে থাকবে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বন্যা, খরা, দুর্যোগ ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য কর্মসূচি, দুর্বল, বৃদ্ধ এবং বেকারদের জন্য সেফটি নেট ইত্যাদি।

গ্রাম এলাকায় জমিও আয় ও শক্তির প্রধান উপাদান। তাই, মোট আয়ের বিরাট অংশ এবং সামাজিক প্রভাবও প্রভাবশালীর হাতে এসে যায়। দরিদ্র কৃষক, কৃষি ক্ষেত্র থেকে, জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম আয় সংগ্রহ করতে পারে। ঐ সকল দরিদ্র কৃষক, তাদের কৃষি উৎপাদন থেকে খুব সামান্য ফসল পায় যা, তার ১/৩ মাসের খাবার যোগান দিতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে, ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে তার এই ফসল কম দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কালের প্রবাহে দারিদ্র্য বৃদ্ধি, জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাবে, দরিদ্র কৃষক তাদের সামান্য জমি বা ভিটা-মাটি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। যার ফলে, একদিকে বড় কৃষক এবং বিত্তবানদের জমির এবং অবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্য দিকে দরিদ্র কৃষক শেষ সম্বল বিক্রি করে, নাম লেখাচ্ছে ভূমিহীন মিছিলে।

উন্নততর জ্ঞান ও দারিদ্র্যের পরিমাপ, দারিদ্র্য বিমোচনকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে। উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে, বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ জরুরি। জনসংখ্যা ইস্যু, সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত, অন্য ইস্যুগুলোর চাইতে আলাদা নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যদি দেশের জনগণ স্বাস্থ্যহীন, অশিক্ষিত এবং বেকার থাকে, তাহলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কখনই ভূমিকা রাখতে পারে না।

উন্নততর জ্ঞান এবং দারিদ্র্যের পরিমাপ, দারিদ্র্য বিমোচনের প্রক্রিয়াকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে। উক্ত প্রক্রিয়ায়, ৩ (তিন) মূল প্রশ্নের অবতারণা হয়– দরিদ্র কারা? কেন তারা দরিদ্র? দারিদ্র্যতা বিমোচনের কি করণীয় আছে? এই নিরূপণ প্রক্রিয়াই, কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি নির্ধারণ করে। যেমন– চীনে দারিদ্র্য নিরূপণ কার্যে দেখা গেছে, দরিদ্ররা মূলত অপ্রতুল সম্পদ বিশিষ্ট আন্তঃদেশীয় এলাকাগুলোতে কেন্দ্রীভূত এবং এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ লক্ষ্যমাত্রাসম্পন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি। অন্যদিকে ভারতে দেখা গেছে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কার।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে, সরকার, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা, দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ এবং জাতি সংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় এবং অংশীদারিত্ব সমন্বয় জোরদার করা গেলে, তা দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের সমর্থনপুষ্ট প্রকল্পসমূহের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশের অধিক এনজিও ভিত্তিক। দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায়, আরও কার্যকর শ্রম বিভাগ প্রবর্তনের জন্য আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা, নীতি এবং কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এই বাস্তবায়ন অবশ্যই দ্রুততর হতে হবে এবং একই সাথে প্রত্যাশাও বাস্তবসম্মত হওয়া চাই। মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা, কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য্য। প্রয়োজন প্রকল্পের প্রাথমিক রূপরেখার মানের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ, ব্যাপকতর তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন ইত্যাদি।

চূড়ান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে, পূর্বেই প্রয়োজন কেন্দ্রীয় এবং বিকেন্দ্রীয়ভাবে, পরিকল্পিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গ্রাম এলাকার আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব হবে এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সহজশর্তে এলাকাভিত্তিক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত ঋণ যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকতে হবে। ঋণের কার্যকারিতার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং সর্বোপরি তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং দামের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে সরকারকে।

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও কৃষি উপদেষ্টা

রা শে দা কে. চৌ ধূ রী

শিক্ষার মান বাড়াতে চাই বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা এ মুহূর্তে খুবই জরুরি। গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য চারটি জিনিস খুবই প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে-প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক, যথাযথ শিক্ষার্থীবান্ধব ক্লাসরুম, শিক্ষার্থীবান্ধব যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া মনমানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খেলাধুলা-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি। বর্তমান সরকার শিক্ষাক্রমে একটি বিষয় চালু করেছে, সেটা হলো চারুকলা। তবে এ চারুকলার শিক্ষকও নেই এবং এর জন্য বাজেটে বরাদ্দও নেই। আমি মনে করি, পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যে সহায়ক বই, সুস্থ মনমানসিকতার জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদির জন্য বাড়তি বরাদ্দ লাগবে। কাজেই ওইভাবে বরাদ্দ কিন্তু সরকার এখনও দিতে পারেনি।

বর্তমান বাজেটে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়। তবে আমাদের শিক্ষানীতিতে সব ধরনের দিকনির্দেশনা আছে। শিক্ষানীতিটা বাস্তবায়ন হলেই এটা সম্ভব। শিক্ষানীতিতে তিনটা বিষয় স্পষ্ট আছে। একটি হলো বৈষম্য দূর করতে হবে। এতে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার মধ্যে একটি সমন্বিত বিষয় আনতে হবে। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। আমি মনে করি, শিক্ষানীতি ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতির যথাযথ বরাদ্দ এবং যথাযথ মনিটরিং খুবই প্রয়োজন। কারণ যথাযথ ব্যবহার না হলে এ বরাদ্দ কোনো কাজে আসবে না।

আমরা প্রায়ই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলে থাকি। কিন্তু তার আড়ালে একটা বিষয় থাকে তা হলো দক্ষ জনশক্তি তৈরি। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হলে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তবে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষায় বরাদ্দ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এই দুটি জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার জন্য, ভৌত অবকাঠামো তৈরির জন্য, প্রশিক্ষিত করার জন্য অনেক কারিগরি বিদ্যালয় আছে। সেখানে বাজেটের অংশ এতই কম যে, শিক্ষার্থীরা এখানে আসতে আগ্রহী হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। যেমন একটি টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে আমাদের উচিত, যারা মাধ্যমিক থেকে ঝরে পড়ে, তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দেশে একটা দক্ষতা উন্নয়নমূলক নীতি হয়েছে। এটি খুবই ভালো একটি নীতি; যেটি ২০১১ সালে হয়েছে। আমরা এ নীতি বাস্তবায়নে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ এখনও পাইনি। আমরা শিক্ষানীতির একটি রোডম্যাপ চাই ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক নীতির একটি রোডম্যাপ চাই। রোডম্যাপ বলতে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দিয়ে যাতে আমরা একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। সেটার প্রয়োজন আমাদের আছে।

আসছে বাজেট নিয়ে আমাদের মোটা দাগের প্রত্যাশাটা হলো, সরকার যে অঙ্গীকার করেছে সেটা পূরণ করবে। বিশেষ করে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের বিষয়টা। কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন এটা তো নির্ভর করে কী কী প্রয়োজন সেটার ওপরে। সে কারণে আমি আবার দৃষ্টি ফেরাবো, সরকার যেসব ঘোষণাপত্রগুলো স্বাক্ষর করেছে তার দিকে। বাংলাদেশসহ বিশেষ করে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে শতাধিক দেশ অঙ্গীকার করেছিল, ২০১৫ সালের মধ্যে বাজেটের ২০ শতাংশ অথবা জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেবে। বাংলাদেশ প্রয়াস নিয়েছিল ধীরে ধীরে ২০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ২০০৭-০৮ সালে আমরা সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেখেছি ১৪ শতাংশের ওপরে। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে এটি নেমে ১১ শতাংশের একটু বেশিতে দাঁড়িয়েছে, জিডিপির ২ দশমিক ৭ শতাংশ। যেটা এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর চেয়েও কম। বাংলাদেশে বাজেট বরাদ্দের বাস্তবতা চিন্তা করলে আমরা যেটা বুঝি চাল-ডাল-নুনের হিসাব। ভর্তুকি দেয়ার বিষয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিষয়। সবকিছু চিন্তা করলে ২০ শতাংশ রাতারাতি বরাদ্দ দেয়া হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এ বাজেটে আমরা চাই সরকার একটি রোডম্যাপ দেবে আমাদের। যেমন ২০১৪ সালে আমাদের পক্ষ থেকে দাবি করেছি ন্যূনতম ১৪ শতাংশ হতে হবে শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ। আগামী বছরে ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ-এ উন্নীত করে অন্তত ২০১৮ সালের মধ্যে যদি ২০ শতাংশে যেতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে তার অঙ্গীকার পূরণে সক্ষম হবে।

আমাদের মনে হয়, নিরক্ষরতার হার কমানোর ক্ষেত্রে বাজেটের প্রণোদনা দুই ভাবে আসতে পারে। একটি হলো, শিক্ষার যে মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা, তাকে শক্তিশালী করে প্রাথমিক শিক্ষার মানের জন্য যথাযথ বরাদ্দ। যথাযথ বরাদ্দ বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তা হলো, আমাদের প্রাথমিক যে শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ শিক্ষার যে ভিত্তি, তাতে বরাদ্দ বাড়ানো। বেশিরভাগ চলে যায় শিক্ষার অবকাঠামো নির্মাণে অথবা শিক্ষকদের বেতন-ভাতায়। দুটিরই প্রয়োজন আছে; কিন্তু শিক্ষার মানকে বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। সেখানে যদি প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করে বের হয়, তাহলে কিন্তু নিরক্ষরতার হারও কমবে। দ্বিতীয় হলো, যারা ঝরে পড়ে গেছে, যাদের আমরা ধরে রাখতে পারিনি, যারা শিক্ষার আলোয় আসতে পারিনি, যাদের আমরা বলি লেফট আউট,

মিসড আউট, ড্রপ-আউট- এমন তিনটা গ্রুপ। এ তিনটা গ্রুপকে যদি শিক্ষার আলোয় আবার নিয়ে আসতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে যথাযথ বিশেষ বরাদ্দের ওপর। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে একটা উপায়, সেখানে যারা ঝরে পড়েছে তাদের জন্য শুধু প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ দিলে হবে না। সরকারের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমান তালে গুরুত্ব দিতে গেলে বেসরকারি সহায়তা নিতেই হবে। সেখানে বেসরকারিভাবে যারা এ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালাচ্ছে তাদের যথাযথ সহায়তা দেয়া।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, ঝরে পড়া নিয়ে দুটি বিষয়ের ওপর প্রধানত কাজ করতে হবে। ঝরে পড়াটা কাদের মধ্যে হচ্ছে। হয় দরিদ্র না হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী অথবা আদিবাসীদের অথবা প্রতিবন্ধীদের মধ্যে। এরা ক্লাসরুমে এসে তাদের মাতৃভাষায় পড়তে পারে না ভাষাটা বুঝতে পারে না। এটি চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে বেশি দেখা যায়। এদের সবার জন্য বাজেট বরাদ্দ হবে না। বিশেষ ব্যবস্থায় তা করতে হবে। যারা অতিদরিদ্র যেমন, বস্তি এলাকার, ভূমিহীন, হাওর-বাঁওরের শিক্ষার্থী, এদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট, শুধু বিস্কুট দিলে হবে না। বিস্কুটে পুষ্টি হবে, কিন্তু তার খিদে মিটবে না। ভারতের মতো সেখানে খিচুড়ি দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমি অবশ্য খিঁচুড়ির কথা বলব না। আমার মনে হয়, ডিম ভাজি দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে এনজিওদের অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু বাজেটের যথাযথ বরাদ্দ থাকতে হবে। বাজেটে পরিধি বাড়াতে হবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তিটা কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু উপবৃত্তির পরিধিটা বাড়ানো হয়েছে, প্রসার ঘটেছে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও তা দেয়া হচ্ছে। ২০০৩ সালে এটি চালু হয় ১০০ টাকা করে, এখনও ১০০ টাকা, যার মূল্য এসে ঠেকেছে ৫০ টাকায়। আমাদের দাবি, এটি ২৫০ টাকা করা দরকার। এটি পর্যালোচনা করা উচিত এজন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে সরকারের কাছে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ, আসে। আমি মনে করি, যেখানে এমপিওর প্রয়োজন আছে সেখানে দিতে হবে। একটা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০০ ও বেশি কম শিক্ষার্থী থাকলেও সেখানে এমপিও দেয়া হচ্ছে। আমরা এমপিওর চেয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার দেয়া হলে ঝরে পড়া রোধ হবে ও অপুষ্টি রোধ হবে। এতে শিক্ষার মানও বাড়বে। একটা ক্ষুধার্ত শিশু ঠিকমত শিখবে এটা আশা করা যায় না। যে বিষয়টা আতঙ্কিত করে তা ঝরে পড়া বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্কুলে না আসা তা নয়, তাদের অপুষ্টিও। বাংলাদেশ কিন্তু ডেঞ্জার জোনে আছে শিশুপুষ্টির ক্ষেত্রে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলেছে, দেশে ১৭ শতাংশ শিশু ভীষণ রকমভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি রোধে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে ঝরে পড়া রোধ হবে এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। তিনটি জায়গায় সফলতা পাওয়া যাবে। একটা ঝরে পড়া রোধ, অপুষ্টিহীনতা রোধ ও মনোযোগ বৃদ্ধি। এটি নির্ভর করছে ব্যবস্থাপনার ওপরে। খাবার বরাদ্দের বিষয়টার মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সরকারকে নিতে হবে। আমরা স্থানীয় সরকারকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখেছি। তাদের দায়িত্ব দিচ্ছি না। এটাতে সংসদ সদস্যদের হাত দেয়া উচিত নয়। আমরা মনে করি, এ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এটার দায়িত্ব নিলে প্রথমে হোঁচট একটু খেতে হবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে কোচিং সেন্টার। আমরা চাই দেশে কোনো কোচিং সেন্টার থাকবে না; কিন্তু অভিভাবকরা মোহে পড়ে এর পেছনে ছুটছে। সরকার, বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী এর লাগাম টানতে চেষ্টা করেছেন। একটা হিসাব বলেছে, দেশে কোচিং বাণিজ্যে ৩২ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। এত বড় টাকার লাগাম টানা সহজ নয়। একটা উপায় আছে, সেটি হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অভিভাবকদের আস্থা ফিরিয়ে আনা। অতএব শিক্ষার মান বৃদ্ধি তা প্রাতিষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক যাইহোক যথাযথ বরাদ্দ দিতে হবে। এ কোচিং সেন্টারগুলোর লাগাম টেনে ধরার জন্য, এদের দৌরাত্ম্য কমানোর জন্য কোনো রকম করারোপ করার ব্যবস্থা চালু হয়নি। এখানে আয়কর বিভাগের একটি শক্তিশালী নজর থাকা দরকার।

অর্থমন্ত্রী সব সময় বলেন, আমি শিক্ষায় ও সক্ষমতা বিনির্মাণে বরাদ্দ দিতে চাই। যেখানে আয়কর ফাঁকির বিষয়টি আছে সেখানে যথাযথ মনিটরিং করতে হবে। বিশেষ করপোরেট ট্যাক্স হলিডের নামে একটা সুযোগ দেয়া হয়। সেটা কিন্তু সরকারকে দেয়া দরকার, আমরা দাবি করছি। যারা ট্যাক্স হলিডে নেন তারা বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এটির প্রয়োজন আছে। কিন্তু করপোরেট সোশ্যাল দায়িত্বটা না বুঝে তারা যে ট্যাক্স হলিডের সুযোগ পাচ্ছেন সেই অর্থটা যদি শিক্ষার উন্নয়নে দেন, এটাকে বলে ট্যাক্স সোয়াপ ফর এডুকেশন। এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু আছে। সেটি দিতে পারলে বিশাল অঙ্কের জোগান হয়। কিন্তু তাদের দেয়া টাকাটি সঠিকভাবে শিক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে বা স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা-তা আমরা কীভাবে জানব। এ আস্থা ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটা কর বিভাগের। টিআইবির হিসাব বলে, বাংলাদেশে দুর্নীতি খাতে ২.৫ শতাংশ আমরা খেয়ে ফেলি, ২ শতাংশ হারিয়ে ফেলি মোট জিডিপির। সেই দুর্নীতির ২ শতাংশ নির্মূল করা সম্ভব নয়। এটি যদি ১ শতাংশেও নামিয়ে আনা যায় এখান থেকে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা জোগান হতে পারে। আরেকটি আছে সহিংসতার কারণে জিডিপির একটি বড় অংশ চলে যায়। সেটিও দেখানো হয়েছে জিডিপির ২ শতাংশ। আমাদের দেশে যে সহিংসতা বিরাজ করছে সেটির জন্য নানা ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। এ জায়গাটাতে লাগাম টানতে হবে এবং এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

রাশেদা কে. চৌধূরী

নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

[২১ মে ২০১৪ তারিখের *আলোকিত বাংলাদেশ*-এ প্রকাশিত লেখার পুর্নমুদ্রণ।]

রফিকুল ইসলাম খোকন ও
বাবুল সরদার

এখন নতুনভাবে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে হবে

একটি বিশেষ অঞ্চলে যে আবহাওয়া স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করে বা যে আবহাওয়ার প্রভাব বেশি থাকে, সেটিকে ওই অঞ্চলের জলবায়ু বলা হয়। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহের ধরন– এগুলো জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত। কোনো অঞ্চলের ভূগোল, বৈশ্বিক বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র-স্রোত, বনাঞ্চল, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ও অন্যান্য কিছু বিষয় সে অঞ্চলের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে এবং স্থানীয় আবহাওয়ার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষ যতকাল বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে যাযাবর জীবন যাপন করতো ততকাল পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। কিন্তু যখন থেকে মানুষ সভ্যতার সূচনা করেছে, তখন থেকেই পরিবেশের উপর আঘাত হানছে একের পর এক। আরও চুলচেরা বিচার করলে দেখা যাবে, মানুষ বিংশ শতাব্দীতেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে পরিবেশের। এর একমাত্র কারণ, জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞানের চরমতম বিকাশ, শিল্প বিপ্লব আর মানুষের লোভ-লালসা।

পৃথিবীর উষ্ণতা মূলত দুটি কারণে বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্যজনিত উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে পৃথিবীর অক্ষরেখার পরিবর্তন, সূর্যরশ্মির পরিবর্তন, মহাসাগরীয় পরিবর্তন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত মূলত দায়ী। কতিপয় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মনুষ্যজনিত উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে বর্তমান কালে উষ্ণতা বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO2), জলীয় বাষ্প, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন (CFC) অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রীনহাউস গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে কম্বলের মতো একটা আবরণ তৈরি করে, যা ভেদ করে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বের হতে পারে না। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির পেছনে বহুলাংশে দায়ী কার্বন-ডাই-অক্সাইড এ পরিমাণ প্রাক্-শিল্পযুগ সময়ের (১৭৫০ সাল) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ১০০ ppmv (parts per million by volume) বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে বিগত ৩০-৪০ বছরেই প্রায় ৫০ ppmv বৃদ্ধি পেয়েছে। সভ্যতা বিকাশের জন্য আমরা বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি জীবাশ্ম জ্বালানির উপর, যা প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে। আবার দ্রুত হারে বন-ধ্বংস ও ভূমি বিন্যাসের পরিবর্তন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঞ্চয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বন ধ্বংসের ফলে সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অবস্থায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়।

গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে একটা প্রটোকল গঠন করা হয়, যা 'কিয়োটো প্রটোকল' নামে পরিচিত, যাতে ৩৭টি শিল্পপ্রধান দেশ তাদের গ্রীন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের হার কমানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করাই যথেষ্ট নয়, সত্যিকার অর্থে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এমনকি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন, এখনই যদি কোন দৈবক্রমে মনুষ্যজনিত গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করা যায়, তারপরও বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে, যদিও বৃদ্ধির হার বর্তমান হারের চেয়ে অনেক কম হবে। কারণ হল, বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেশি এবং মুখ্য গ্রীনহাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর দীর্ঘস্থায়ী জীবন। তার অর্থ আমাদের যেমন নিঃসরণ মাত্রা কমাতে হবে, সাথে সাথে জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

একথা সত্য যে, জলবায়ুর পরিবর্তন একটা বৈশ্বিক সমস্যা এবং এই সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বাংলাদেশ বা বৃহত্তর বাংলার জনগণের ভূমিকা খুবই নগণ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুই বাংলা হয়ত এড়াতে পারবে না, কিন্তু আমাদের সচেতন ও তৎপর হতে হবে যাতে ক্ষতিকারক প্রভাবকে লঘু করার জন্য আমরা যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারি।

আমরা গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখব, বাংলাদেশে বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বেড়েছে। এই সময়ে শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছে ৬ লাখেরও বেশি মানুষ। ধ্বংস হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ। দুর্গত এলাকার মানুষের সমাজ, সংসার এবং সংস্কৃতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের মানুষেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে খুব ভালোভাবেই চেনে। ১৯৭০ সালের পর যখন বিশ্বব্যাপী এই দুঃসংবাদটি প্রচার হলো যে, পৃথিবীর তাপ বাড়ছে, সমুদ্রের পানি বাড়ছে। তলিয়ে যাবে নিচু উপকূল। তখন বাংলাদেশের পরিবেশবাদীরা, সরকার ও জ্ঞানী মানুষরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নিচু ভূমি। বাংলাদেশের ৭১২ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলে প্রায় ৪ কোটি মানুষের বসবাস। খাদ্য ও মৎস্য সম্পদ

উপৎপাদনের বড় ক্ষেত্র হলো এই উপকূল। তাই কোন কারণে যদি এই উপকূল তলিয়ে যায়, লবণ পানি জোয়ারের তোড়ে দেশের আরো ভেতরে প্রবেশ করে, তাহলে মহাসঙ্কট দেখা দেবে।

আমাদের দেশের মধ্যাঞ্চলের কৃষি এবং পানীয় জলের জন্য এখন ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করছি। লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে ভূ-গর্ভস্থ মিঠা পানি নষ্ট হয়ে যাবে। গাছ-গাছড়া এবং জলাশয় নদীর সংকট দেখা দেবে। তাই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানেই বাংলাদেশের সর্বনাশ।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ইতোমধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বাড়াতে থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কুফলগুলোর মধ্যে থাকবে আরো ঘন ঘন বিধ্বংসী বন্যা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি তলিয়ে যাওয়া। কারণ উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০ সেন্টিমিটার উচ্চতা বাড়লে ৫০ মিটার ভূমি পানিতে তলিয়ে যায়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে অনেক জমি স্থায়ীভাবে পানিতে তলিয়ে গেলে মানুষজন তাদের জীবিকা এবং জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। উপকূলীয় মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য খরচও বাড়বে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এলাকার মধ্যে পড়ে এবং সেখানে এমন অনেক ইকোসিস্টেম রয়েছে যেগুলোর উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল। উপকূলীয় এলাকা ঘিরে তেল শোধানাগার, আনবিক শক্তি কেন্দ্র, বন্দর ও শিল্প সুবিধাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো থাকে। বর্তমানে ২০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ পৃথিবীর উপকূলীয় প্লাবনভূমিতে বসবাস করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ মিটারেরও কম উচ্চতার মধ্যে তারা ২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার জায়গায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান সম্পদ নিয়ে থাকছে।

পঞ্চম আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী, দেশে গড় বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক ৩৪ শতাংশ হলেও বরিশাল বিভাগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশ। এর পেছনে জলবায়ু অভিবাসন (মাইগ্রেশন) প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতির মুখে পড়া দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ একাধিকবার বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকার পরিবেশেও বিরূপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক মানুষ নিজের আবাস ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিজের এলাকায় জীবন-জীবিকা অব্যাহত রাখার যোগ্যতা হারিয়ে জীবন বাঁচাতে অন্যত্র চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন তারাই জলবায়ু উদ্বাস্তু। "বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন রকম সংখ্যা বলছেন। সেগুলো মোটামুটি ষাট থেকে সত্তর লাখের মধ্যে। কিন্তু কিছু জরিপে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ইতিমধ্যে আশি লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে বলে বলা হচ্ছে।

এটা খুব লজ্জার কথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানব সমাজ যে আতঙ্কের মধ্যে পড়েছে, তার জন্য দায়ী মানুষ নিজেই, প্রকৃতি নয়। এটা আরো বেশি লজ্জার হবে যদি আমরা নিজেদের এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে না পারি। যেভাবে হোক আমাদের এই আত্মনিধন রোধ করতে হবে।

আমরা জানি পৃথিবীতে মানুষকে বসবাস করতে হয় তার স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে মানিয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মানুষরা বরফের ঘরে বাস করে, জলাভূমির লোকেরা বাস করে পানির মধ্যে আর মরুভূমির মানুষরা সেখানকার উত্তপ্ত আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে।

এটা খুবই ভরসার কথা যে, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে নানা উদ্যোগ, নানা গবেষণা। বাংলাদেশও এই উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে নেই। দরিদ্র দেশ হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের হয়ত অনেক ক্ষতি বা কষ্ট হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলা অসম্ভব নয়। কেননা বাংলার মানুষ সব সময় প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব করে, মিতালী করে এ যাবত মূলত কৃষ্টি উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই জীবন-জীবিকা বজায় রেখেছে। তাই আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে বাংলার মানুষ নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে বলে আমরা আশা করছি।

আমাদের আশার কারণ হলো শুধু আমরা নয়, নতুন এই দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবা সংগঠন, পরিবেশবাদী গ্রুপ বাংলাদেশকে সাহায্য করছে। তাই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহযোগিতায় প্রাপ্ত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল নিয়ে বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষরা উদ্যোগ নেবে, বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে নতুন প্রাকৃতিক পরিস্থিতি মানিয়ে নেয়ার।

পৃথিবীর আচরণ স্নেহশীলা মায়ের মত। মা যেমন সন্তানকে শাসন করেন তেমন ভালও বাসেন। মানুষের আচরণে আমাদের ধরিত্রীমাতা অনেক সময় রুষ্ট হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার দানে কোন ঘাটতি নেই। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনে নিচু ভূমি বা উপকূলীয় এলাকা হয়ত ডুবে যাবে কিন্তু তাই বলে আমরা বসে থাকতে পারিনা। ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের কথা ভেবে এখন থেকেই নতুন পেশার কথা নতুনভাবে বেঁচে থাকার কথা আমরা ভাবতে পারি।

রফিকুল ইসলাম খোকন

উন্নয়ন ও পরিবেশকর্মী এবং নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর

বাবুল সরদার

সাংবাদিক ও পরিবেশকর্মী

[বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বাগেরহাট-এ ৫ জুন ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।]

বিশেষ প্রতিবেদন

বেড়ে ওঠার গল্প: মতবিনিময় সভা

“টক খেও না, বাইরে যেও না, অচেনার সাথে কথা বলো না-
যতসব নিষেধমূলক শব্দ
আমার বয়ঃসন্ধিকালের মিষ্টি দস্যিপনা, বাউন্ডুলেপনাকে করেছে জব্দ।
বেড়ে ওঠা আসলে খুবই প্রাকৃতিক, ঋতুর মতই পরিবর্তন,
সমাজ কেন বোঝে না এমন পরিবর্তনে ঘটতে পারে কিছু অঘটন।
এ আমার বেড়ে ওঠার গল্প, আমার জীবনের এক অধ্যায়,

বর্তমান প্রজন্মের সংগীতশিল্পী মুনের গানে উপস্থিত কিশোর-কিশোরীরা যেন তাদের নিজেদের না বলা কথাগুলোই শুনতে পেল। আর তাই কিশোর-কিশোরীরা একদিকে যেমন ছিল আনন্দিত, ঠিক তেমনি হয়েছিল অনুপ্রাণিত। গণসাক্ষরতা অভিযান ও তার সহযোগী সংগঠন এবং অংশীজনের সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে আয়োজিত ‘বেড়ে ওঠার গল্প’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সেদিনের দৃশ্যটা ছিল একটু অন্যরকম। সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কিশোর-কিশোরীরা তাদের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও চাহিদা সম্পর্কে উপস্থিত সুধীজনের সাথে মতবিনিময় করে। বড় বড় মানুষের সাথে সেদিন একাত্ম হয়েছিল সদ্য শৈশব পেরোনো এক ঝাঁক কিশোর-কিশোরী। নীতিনির্ধারক, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা এই সেমিনারে শুধু কথা বলেননি, শুনেছেনও। কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে তাঁরা শুনেছেন তাদের সচরাচর বলতে না পারা কথাগুলো। গত ১১ জুন ২০১৪ বুধবার ঢাকার এলজিইডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল পুরো আয়োজন। দিনব্যাপী এই আয়োজনের শুরুটা ছিল পুরোপুরি কিশোর-কিশোরীদের জন্য। দ্বিতীয় ভাগে কিশোর-কিশোরীদের সাথে যোগ দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী, বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং অতিথি বক্তাগণ।

আমাদের দেশে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী মোট ২৭ মিলিয়ন যারা কিনা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (সূত্র: ইউনিসেফ)। যাদের অনেকেই শিক্ষা জীবন সমাপ্তির আগেই কিংবা শিক্ষা জীবন শুরু না করেই জীবিকার সন্ধানে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয় এবং বিয়ে করে ফেলে। সামাজিক সংস্কারজনিত বাধা, পারিবারিক রক্ষণশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাবের কারণে বিবাহিত জীবনে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণ একজন কিশোর-কিশোরীর জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় মানসিক পরিবর্তনও। এই পরিবর্তন যে মানুষের জীবনচক্রের স্বাভাবিক অংশ সেই অনুভূতির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকের অজ্ঞতা ও অসতর্কতা যেমন কাজ করে তেমনি জড়তা এবং লজ্জা অনুভব করেন কেউ কেউ। ফলে এই সময়টাতে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে কিশোর-কিশোরীরা সবাই নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং কখনও কখনও নেতিবাচক ঘটনার কারণ হয়। বাবা-মা, অভিভাবকদের এই সংক্রান্ত শিক্ষা ও সচেতনতা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সমাজের সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষ করে নীতি নির্ধারকদের ইতিবাচক মনোভাব। এ পরিস্থিতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের অন্যান্য অংশীজনদের মাঝে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানসহ ৫টি সংস্থা কৈশোর প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ব্র্যাক, হাসাব, ইউনিসেফ, ইউসেপ, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, এফপিএবি, পিএসটিসি, বিএনপিএস, জাগো ফাউন্ডেশন, অপরাজেয় বাংলাদেশ, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং কিশলয় স্কুল-এর কিশোর-কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে এই আয়োজনে। বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে সকলের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত কিছু ভিডিও ক্লিপিংস আগত সকলের জন্য প্রদর্শিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার এই আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রারম্ভিক কিছু কথা বলেন। এরপর কিশোর-কিশোরীদের গান গেয়ে শোনান সংগীত শিল্পী মুন। মুন যখন সুরে সুরে গেয়ে ওঠে-

“রিকশা ভাড়া বাঁচিয়ে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়ার দিন
যেদিন ভর করেছিল মাথায় শয়তানের জ্বীন
আমার জামার পকেটে রাখা গচ্ছিত থার্টিন
দশ টাকার র‍্যাম্বো’র পোস্টার তিন টাকার কোন আইসক্রিম
পাঁচ মিনিট পরে ক্লাসে গিয়ে বললাম স্যার মে আই কাম ইন?
স্যার বললো দেরী হলো কেন? দাঁড়িয়ে থাকো কান ধরে মিনিট দু-তিন
আসলে তা নয় বন্ধু এই-ই রিস্কি ক্লাস নাইন”

উপস্থিত কিশোর-কিশোরীরা যেন আরও বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠে তাদের রিস্কি নাইনের গল্পগুলো বলার জন্য। একের পর এক তারা বলতে থাকে তাদের গল্পগুলো। কি চায় তারা, কি হলে তাদের জন্য ভালো হয়? কোথায় তাদের প্রাপ্তি আর কোথায় অপ্রাপ্তি! একটু একটু করে কথা বলা শুরু করে তারা। আর এভাবেই সার্থক হয়ে ওঠে ‘বেড়ে ওঠার গল্প’ শীর্ষক দিনব্যাপী আয়োজন। অপরাজেয় বাংলাদেশ থেকে আগত কিশোরী স্বপ্না আক্তার বলে, “ভয়-ভীতির কারণে আমরা বাবা, মা শিক্ষকদের সাথে সহজ হতে পারিনা।” নেত্রকোনার কিশোরী লাকী ক্ষোভের সাথে জানায়, কিশোর বয়সে পা রাখলেই পরিবার এবং সমাজ মনে করে মেয়েরা বড় হয়ে যায়। উপস্থিত অনেক কিশোর জানায়, স্বপ্নদোষের কারণে আগে তারা লজ্জা পেত, অপরাধবোধে ভুগত। কিন্তু পরে বাসায় তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার পর এখন তারা জানে স্বপ্নদোষ বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীরাও আর সবার মতোই একই সাথে একইভাবে তাদের নিজেদের মতো করে তাদের গল্পগুলো বলে। গল্প বলার এক পর্যায়ে তাদের সাথে যোগ দেয় তাদের প্রিয় নাট্যাভিনেতা মনির হোসেন শিমুল। শিমুলকে পেয়ে তাদের আনন্দ আরও বেড়ে যায়। এরপর শিমুলের পরিচালনায় চলতে থাকে গল্প বলা,- ‘বেড়ে ওঠার গল্প’।

এরই মাঝে কিশোর কিশোরীদের সাথে ‘বেড়ে ওঠার গল্প’ শীর্ষক এই দিনব্যাপী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, এবং শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহতাব খানম, ব্র্যাকের জেন্ডার জাস্টিস এবং ডাইভারসিটি বিভাগের পরিচালক শিপা হাফিজা এবং সমাজতত্ত্ববিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. আই. মাহবুবউদ্দিন। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীর সভাপতিত্বে অতিথিদের সাথে একইভাবে চলতে থাকে কিশোর-কিশোরীদের গল্প বলা।

অধ্যাপক ড. মেহতাব খানম বলেন, পাঠ্যবইয়ে সংযুক্ত বয়ঃসন্ধিকালীন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধ্যায়গুলো সঠিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

ব্র্যাকের পরিচালক শিপা হাফিজা বলেন, বয়ঃসন্ধিকালীন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় বার্তাগুলো সকলের কাছে পৌঁছে দেয়াটা প্রাথমিক অবস্থায় যতটা কষ্টসাধ্য ছিল এখন আর তা নেই। এখন শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করছে।

অধ্যাপক ড. এ. আই. মাহবুবউদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের সময়ে তিনটি বিষয় জড়িত- শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক। তিনি সেক্সুয়্যাল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিষয়ে তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও সমালোচনা করেন।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, উন্নত দেশে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। এই সংক্রান্ত সঠিক তথ্য কোথায় এবং কিভাবে জানা যাবে তা সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বয়ঃসন্ধিকালীন সময়কে মানবসভ্যতারই একটি ধারাবাহিকতা এবং অংশ বলে উল্লেখ করে এই সময়কে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে স্বাগত জানিয়ে উৎসব পালনের কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে শারীরিক পরিবর্তন হবেই। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। স্বাভাবিক এই বিষয় নিয়ে যত বেশী আলোচনা হবে তত ভালো। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো অতি দ্রুত এবং সহজবোধ্য করে সকলের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। তিনি এই বিষয় নিয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার, লেখকদের কাছে নাটক, লেখা আশা করেন বলে জানান।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী তাঁর সভাপতির ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বিদ্যালয়ের বাইরের কিশোর-কিশোরীদের বেড়ে ওঠার গল্প জনসমক্ষে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সুপারিশসমূহ

- কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে অভিভাবক, পিতা-মাতাসহ সাধারণ মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন।
- শিক্ষকদের এই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন।
- কিশোর-কিশোরীদের সাথে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।
- এই বিষয়ে গণমাধ্যমের আরও বেশী ভূমিকা রাখা দরকার।
- প্রজনন/যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠক্রমকে আরও কার্যকর করতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের জন্য জাতীয় নীতিমালা চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।
- সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বার্তাগুলো সকলের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

সাকিলা মতিন মৃদুলা
উপকার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান

একজন দেলোয়ারের একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠা

নানা অর্জন আর সফলতার পরেও শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে নানা সমস্যা। শিক্ষা ব্যবস্থা যেন ধ্বংস ও হিংসার বলি না হয় সে জন্য অদম্য গতিতে কাজ করছেন অনেকেই। কিন্তু তারপরও যে সংবাদগুলো আমাদের দুঃখ দেয়, কষ্টের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, সেই সংবাদগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকুক বা নাই থাকুক মিডিয়া আমাদের সামনে তা তুলে ধরছে জোড়ালো ভাবে। অথচ দেশকে পাল্টে দেওয়ার মতো অনেক সংবাদ আছে চারপাশেই।

মুন্সীগঞ্জের দেলোয়ার। তথাকথিত বিখ্যাত বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে দেলোয়ার বিখ্যাত কেউ নয়। কারণ এদেশে নিরবে নিভৃতে অন্যের জন্য কাজ করে যাওয়া মানুষদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হতে পারে না। যদিওবা বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছা থেকে সমাজকে বদলে দেওয়ার কাজও করেন না তারা। সত্যিকার অর্থেই সমাজকে পাল্টে দিতে বিরামহীনভাবে কাজ করে যান তারা। তাদের ক'জনের সংবাদ আসে গণমাধ্যমে? হয়তো আসে কিন্তু হাজারো না আসার ভীড়ে তা কি ধর্তব্যের মধ্যে পরে? আমার মনে হয় না। এই দেলোয়ার একজন ভাসমান চা বিক্রেতা। তার বাবা রিকসা চালক। অভাবের সংসার। ১০ বছর বয়স থেকে কখনো অন্যের বাড়িতে কাজ করে আবার কখনোবা চা বিক্রি করে সংসারে সাহায্য করতে হতো তাকে। মুন্সীগঞ্জ সদরের হাটলক্ষ্মীগঞ্জের দেলোয়ারকে বিদ্যালয়ে যেতে হতো হেঁটে, ১০ মাইল দূরে। ২০০৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয় সে। তার এই অকৃতকার্য হওয়ার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে সে। অনেক দূরে বিদ্যালয় থাকার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে সে, এমন একটা ভাবনা নিয়ে হাটলক্ষ্মীগঞ্জে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করে দেলওয়ার। হতদরিদ্র ১৭/১৮ বছরের নিঃশ্ব এই যুবকটি খালি হাতে শুধু মনোবলের জোড়ে বেড়িয়ে পড়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য।

স্কুল কোথায় হবে, জায়গা পাওয়া যাবে কি-না, পেলেও তার টাকা আসবে কি করে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি মিলবে কিনা, কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে এমন অনেক ভাবনা আসে দেলোয়ারের মনে। প্রথমে সে মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবে যায়। শীর্ষ পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার কথা হয়। সবাই আশ্বাস দিলেও দিন থেকে মাস, মাস থেকে কেটে যায় আরো কয়েকটি মাস কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওই সাংবাদিকদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা পায় না দেলোয়ার।

প্রেসক্লাব থেকে সহায়তা না পেয়ে সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য যোগাযোগ শুরু করে। দেলওয়ার নেতাদের বোঝাতে থাকে, একটি বিদ্যালয়ই পারে হাটলক্ষ্মীগঞ্জের উন্নতি নিয়ে আসতে। নিজের উদাহরণ টেনে বলে, হাটলক্ষ্মীগঞ্জে একটি বিদ্যালয় থাকলে এসএসসি পরীক্ষায় তার খারাপ ফল কখনই করতে হতো না । কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে কোনো সহায়াতাই পায় না দেলোয়ার। স্কুলে যায় না এমন কিছু শিক্ষার্থীর ছবি তুলে নিজের টাকা দিয়ে ব্যানার বানিয়ে তা টাঙ্গিয়ে দেয় এলাকার বিভিন্ন স্পটে। কিন্তু তাতেও সাড়া মেলে না।

২০০৯ সালের শুরুর দিকে তখনকার স্থানীয় সংসদ সদস্য হাটলক্ষ্মীগঞ্জের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন অন্য একটি এলাকায়। আগে থেকে এই সংবাদ শুনে বিশাল ব্যানারে স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে ধরে দেলোয়ার। নজরে আসে সংসদ সদস্যের। নির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত করে দেলোয়ারের সঙ্গে কথা বলেন ওই

সংসদ সদস্য। দেলোয়ার তাকে জানান, হাটলক্ষ্মীগঞ্জের সরকারি খাস জমি স্থানীয় রাজনীতিবিদদের দখলে। খাস জমি থেকে মার্কেট উচ্ছেদ করে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

স্থানীয়দের ডেকে সমাবেশের মাধ্যমে দেলোয়ারের স্বপ্নের কথা জানান সংসদ সদস্য। তার আহ্বানে এগিয়ে আসেন এলাকার প্রবীণ কিছু ব্যক্তি। শুরু হয় মার্কেট উচ্ছেদের কাজ। ২০১০ সালে টিনের ঘরে শুরু হয় শিশু শ্রেণীর কার্যক্রম। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় বিদ্যালয়ে পড়াবেন কারা? কারণ বেতন ছাড়া এই সময়ে শিক্ষক পাওয়া সত্যিই অনেক কষ্টকর। আবারো শুরু হয় দেলোয়ারের সংগ্রাম। পিছিয়ে পড়া এলাকা বলে হাটলক্ষ্মীগঞ্জে শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। যারা শিক্ষিত তারাও আবার থাকেন ঢাকা শহরে। দেলোয়ার বুঝতে পারে তার মতো স্বল্প লেখাপড়া জানা তরুণ তরুণীদের দিয়ে মান সম্মত শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই দেলোয়ার খুঁজে বের করে এলাকার বিএ পাস কয়েকজন গৃহিণীকে। তাদের সে বোঝায় স্কুলের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষককে কাজ করতে হবে স্বেচ্ছায়। অর্থ ছাড়া। কয়েজন গৃহিণী তাদের স্বামীদের রাজি করানোর শর্তে শিক্ষা দিতে সম্মত হন। দেলোয়ার তাদের স্বামীদের বোঝাতে চেষ্টা করে। সে বলে, এই বিদ্যালয়টি একসময় সরকারি হবে তখন তাদের স্ত্রী হবেন সরকারি শিক্ষক। তাদের নাম হবে। এতে কয়েকজন রাজি হলেও বেশিরভাগই মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেলোয়ার নিরাশ না হয়ে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শুরু করে। এগিয়ে যেতে থাকে হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

২০১১ সালে আবার দেলোয়ারের সংগ্রাম শুরু করে। এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে ইতিমধ্যে দেলোয়ারের নাম সবার মুখে মুখে। আর তাই এই সংগ্রামে দেলোয়ারের সঙ্গে যুক্ত হন এলাকার আরো অনেকে। তাদের বেশিরভাগই নারী। এবার দেলোয়ারের দাবি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা না গেলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কষ্ট করে হেঁটে যেতে হবে বহু দূরে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির এই আন্দোলন। হাটলক্ষ্মীগঞ্জের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অন্য এলাকায় পড়তো তারা দাবি জানালো হটলক্ষ্মীগঞ্জ স্কুলে পড়বে তারা। বিষয়টি নজরে আসে জেলা প্রশাসনের। তলব করা হয় দেলোয়ারকে। দেলোয়ার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুরু হয় স্কুল পরিদর্শনের কাজ। আশপাশ থেকে আরো কিছু বাড়ি উচ্ছেদ করে আরো চারটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়। প্রথম বছরই বিভিন্ন শ্রেণীতে স্কুলে ভর্তি হয় সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থী। বর্তমানে হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪৫ জন। স্থানীয় একটি স্কুলে এত সংখ্যক শিক্ষার্থী সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিখ্যাত হয়ে যাওয়া এ গল্প দেলোয়ারের। গত ১০ মার্চ দেলোয়ারের সঙ্গে কথা হয় তারই প্রতিষ্ঠিত হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে লুকিয়ে থাকা নানা কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। দেলোয়ার বলে, নামী লোক হওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেননি তিনি বরং একটি এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেলোয়ারের ভাবনা ছিল এই স্বপ্নের অংশীদার হবে সবাই। কিন্তু তার এই সুন্দর উদ্যোগে বাধা দেয় অনেকে। দেলোয়ারের ভাষায়, 'ওরা কেমনে পারবে কন? খারাপ কাম কি সমাজে টেকে? ওরা আমার পা টাইনা ধরছে, আমি কইছি পারবেন না, পা আমি ছাড়ামুই। পা ঝাড়া দিয়া ফালাইয়া আমি স্কুল বানাইছি। পরে সবাই আমারে সাহায্য করছে। আসলে সবাই ভালা, দুই চারটা শয়তান সব জায়গাতেই থাকে'। দেলোয়ারের এই কথা গুলো রেকর্ড হচ্ছিল চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরায়। জীবনে প্রথম ভিডিও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা দেলোয়ারের। শুরুতে বল্লো, 'আমি কিন্তু আউলা-ঝাউলা কথা কই। অশিক্ষিত মানুষ। চা বেচি। আমি এমনই কমু'। আপনার যা ভালো লাগে বলুন কোনো সমস্যা নেই, চ্যানেল আইয়ের সাংবাদিকের এমন উত্তরে দেলোয়ার বল্লো, '১০টা পত্রিকায় আর ১০টা টিভিতে আমি হাতে লেইখ্যা স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা জানাইলাম। কেউ আইলো না। আপনারা আইছেন।

দেলোয়ারের আমন্ত্রণেই হাটলক্ষ্মীগঞ্জে যায় চ্যানেল আই। সাংবাদিক আর ক্যামেরা পারসন যে রুমেই গিয়েছে দেলোয়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের বলেছে, 'তোমাগো দেখতে ঢাকা থেইকা লোক আসছে। তোমরা বুঝতেছো না এইডা কতো বড় ইজ্জত তোমাদের। বড় হইলে বুঝবা। তোমরা যখন বড় হইয়া ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার আর মন্ত্রী হইবা এমন ক্যামেরা তোমাগো পিছে পিছে (পেছনে) ঘুরবে।'

জানা গেলে, এ স্কুলে লেখাপড়া করতে কোনো শিক্ষার্থীকে বেতন দিতে হয় না। শিক্ষার্থীদের সবাই হত দরিদ্র। সবজি বিক্রেতা, মাঝি, রিকশাওয়ালা, মাটি কাটা এমন পেশায় জড়িত বেশিরভাগ অভিভাবক। যেহেতু শিক্ষাকরা কোনো বেতন নেন না তাই শিক্ষার্থীদেরও বেতন দিতে হয় না। ২০১২ সালে স্কুলে কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি বিভিন্ন উৎস্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের কাগজ, কলম ও শিক্ষা উপকরণ দিয়ে থাকে।

পর্বের ধারাবাহিক রিপোর্ট। রিপোর্টটি ফেইসবুকে শেয়ার হয় ২০ হাজার বারেরও বেশি। মতামত আসে কয়েক হাজার। আর রিপোর্টটি লাইক করে সাড়ে তিন লাখ মানুষ। রিপোর্টটি দেখেছে তিন লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি মানুষ। এ পরিসংখ্যান ফেইসবুকের। এর বাইরে চ্যানেল আইয়ের নিজস্ব সাড়ে তিন কোটি দর্শক তো আছেই দেখার তালিকায়। আমিনুল সরকার নামের একজন ফেইসবুকে লিখেছেন, 'আমাদের গর্বিত সন্তান বিক্রমপুর জেলার আলোকিত মানুষ দেলোয়ার তোমায় স্যালুট।' জসিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি তার মতামতে বলেছেন, 'দেলোয়ার হোসেন হচ্ছেন গ্রেট সুপারম্যান'। এমন হাজারো মন্তব্য এসেছে দেলোয়ারের জন্য।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান। সরকারি শিক্ষক ছিলেন তিনি। দীর্ঘ ২৮ বছর শিক্ষকতা করার পর অবসরে যান। দেলোয়ারের আহ্বানেই হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্মানী ছাড়া যোগদান করেন তিনি। মতিউর রহমান বলেন, তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে উদ্যোমী অনেক তরুণ দেখলেও দেলোয়ার ব্যতিক্রম। সমাজে এমন দেলোয়াররা দুর্লভ। তিনি বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ নেই দেলোয়ারের। কিন্তু এতে কোনো আক্ষেপ নেই তার বরং যে কোনো কাজে ডাকলেই সবার আগে ছুটে আসে দেলোয়ার।

সহকারী শিক্ষক রিজিয়া আক্তার বলেনে, আমি দেলোয়ারকে চিনতাম না। হঠাৎ একদিনে এসে জানালো শিশুদের পড়াতে হবে। এরপর প্রতিদিনই আসতো। এখন শিশুদের পড়াই। এক দেলোয়ারের কারণেই আজ হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এত উন্নত। প্রত্যেকটি এলাকায় যদি এক জন করে দেলোয়ার থাকতো তাহলে বাংলাদেশের চেহারাই পাল্টে যেত।

স্থানীয় কাউন্সিলর মকবুল হোসেন বললেন, ও আমার কাছে অনেক বার এসেছে। আমি খুব একটা আমলে নেইনি। কিন্তু যখন কাজ শুরু হয়ে গেল তখন আমি আর বসে থাকতে পারিনি। স্কুলের উন্নয়নে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ি। দেলোয়ারকে দেখি আর ভাবি, আমরা যারা রাজনীতি করি তারা যদি দেলোয়ারের মতো হতে পারি তাহলে আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না।

গত ১৫ ও ১৬ মার্চ চ্যানেল আইতে প্রচার হয় দেলোয়ারের প্রতিষ্ঠিত হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই

গত ২৪ মার্চ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জেলা প্রাশাসককে জানান, খাস জমিতে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। নিজস্ব জমি নেই বিদ্যালয়ের। জেলা প্রশাসক ৩৭ শতাংশ খাস জমি চিহ্নিত করে বিনা সেলামীতে বিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রেশন করার নির্দেশ দেন। শিক্ষকরা জেলা প্রশাসককে জানান, টিনের ঘরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। জেলা প্রাশসক নিজস্ব ফান্ড থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেন তিনটি কক্ষ নির্মাণের জন্য। শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫টি ফ্যানের ব্যবস্থা করেন তিনি। সীমানা প্রাচীরের জন্য বরাদ্দ করেন আরো দেড় লাখ টাকা। আর স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ে চাকরি করা শিক্ষকদের প্রতি মাসে সম্মানী দেওয়ারও নির্দেশ দেন। তার নিজস্ব একটি ফোন নম্বর শিক্ষকদের লিখে রাখার জন্য অনুরোধ করেন। স্কুলের যে কোনো প্রয়োজনে তাকে ফোন করার কথা বলেন তিনি।

দেশের পরিবর্তনে এগিয়ে আসা দেলোয়ারের গল্প হয়তো এখন জানেন অনেকেই চ্যানেল আই এর কল্যাণে। সমাজ উন্নয়নের কাজ করার জন্য বড় কেউ হওয়ার প্রয়োজন নাই যে কোন অবস্থানে থেকেই সমাজ পরিবর্তনের কাজ করা যায়। সত্যিকার অর্থে এমন দেলোয়াররাই তো জাতীয় বীর। এমন বীরদের স্যালুট জানাই।

মোস্তফা মল্লিক

সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট

চ্যানেল আই

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ হওয়া চাই

বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কম থাকার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একে একটি বড় সমস্যা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ বরাদ্দ হয় শিক্ষা খাতে। এটা কমপক্ষে ৬ শতাংশ হওয়া দরকার।

গতকাল রবিবার রাজধানীতে 'সবার জন্য শিক্ষা, গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০১৩-১৪' প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অগ্রগতি সত্ত্বেও সারা বিশ্বে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। কারণ, বিশ্বে এখনো পাঁচ কোটি ৭০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে গিয়ে সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রকল্প পরিচালক তালাত মাহমুদ বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখ করে বলেন, বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও ঝরে পড়া মিলিয়ে এখনো বাংলাদেশে ৫০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে।

গতকাল প্রকাশিত বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের ৬৫ কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সের শিশুর মধ্যে কমপক্ষে ২৫ কোটি শিশু মৌলিক পঠন ও গণনা শিখতে পারছে না। এদের মধ্যে ১২ কোটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। অবশিষ্ট ১৩ কোটি টিকে থাকলেও শেখার ন্যুনতম মান অর্জন করতে পারে না। এ ধরনের শিশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনে খুবই দুর্বল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে নাম লেখাচ্ছে। এদের ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষায় লৈঙ্গিক সমতা শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কোচিং বন্ধ করতে পারছি না। দেশে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং ব্যবসা। এটা বন্ধ করলে হয়তো আমাকে মেরে ফেলার জন্য ১০ কোটি টাকা খরচ করে ফেলতে পারে।

শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ সাদিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন, ইউনেসকোর ঢাকা অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিচি ওয়াসু, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর দেশীয় পরিচালক মাইকেল ম্যাকগ্রাথ, বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের সচিব মনজুর হোসেন প্রমুখ।

প্রথম আলো ২.০৬.২০১৪

লিও তলস্তয় স্বর্ণপদক পেলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ রাশিয়ার লিও তলস্তয় আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন। শিশু দিবস উপলক্ষে গত রবিবার মস্কোর ঐতিহ্যবাহী বলশয় থিয়েটারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পদক তুলে দেওয়া হয়।

শিশুদের শিক্ষা ও সেবাদানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাশিয়ান চিলড্রেন ফান্ড প্রতিবছর এই স্বর্ণপদক দিয়ে থাকে। এর আগে মাদার তেরেসা, পোলিও ভ্যাকসিনের উদ্ভাবক আলবার্ত সেবিন এবং সুইডেনের শিশুসাহিত্যিক অস্ট্রিড লিডগ্রেনের মতো ব্যক্তিত্ব এই পদকে ভূষিত হন।

বলশয় থিয়েটারের অনুষ্ঠানে স্যার ফজলে হাসান আবেদের হাতে পদক তুলে দেন রাশিয়ান চিলড্রেন ফান্ডের নেতা ও প্রখ্যাত লেখক আলবার্ত এ লিখানভ। ১১ হাজার শিশু অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অনাথ, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে কনসার্টের আয়োজন করা হয়।

১৯৯১ সালে রাশিয়ান চিলড্রেন ফান্ডের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ৭৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এটি রাশিয়ার অভাবী শিশুদের সামাজিক সহায়তাদানে কাজ করছে।

প্রথম আলো ৩.০৬.২০১৪

দক্ষতার অভাব কর্মসংস্থানের বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী চাকরি প্রার্থীদের দক্ষতার অভাব। এ কারণে ভারত-মালয়েশিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি রয়েছে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা এর চেয়ে বেশি হলেও তাদের যথেষ্ট দক্ষতা নেই। ফলে বিদেশে দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে এমন কাজে নিয়োগ পাচ্ছে না বাংলাদেশিরা।

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে 'বাংলাদেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দক্ষতা: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ঢাকা অঞ্চলের সিনিয়র স্পেশালিস্ট ফ্রান্সিস ডি সিলভা।

সমকাল ৪.০৬.২০১৪

যত বাধাই আসুক, বছরের প্রথম দিনে বই: শিক্ষামন্ত্রী

'যত বাধাই আসুক, বছরের প্রথম দিনে সারাদেশে প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেব। এজন্য এনসিটিবির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে হবে'। বুধবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০১৫ সালে পাঠ্যবই প্রদানের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতায় এ কথা বলেন। এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ এস মাহমুদ, বোর্ডের সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কয়েক বছরে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে, শিশুমৃত্যুর হার কমছে, মাতৃমৃত্যুর হার কমছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে। এখন গ্রামে গেলে কাউকে আর খালি পায়ে, খালি গায়ে দেখা যায় না। শহর-গ্রামের পার্থক্য কমে এসেছে। তিনি বলেন, স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে, ঝরে পড়ার হার কমেছে। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। শিক্ষার অনেক সূচকই এখন উর্ধ্বমুখী। এর পেছনে বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে মূল কাজটি এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা করায় তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। নূরুল ইসলাম নাহিদ ২০১৫ সালের বইয়ে বানান, বাক্য গঠন, জাতীয় চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ছবির স্পষ্টতাসহ অন্যান্য ভুল-ক্রটি কমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বইয়ের কাগজের যথাযথ মান, সেলাই, বাঁধাই, সরবরাহ প্রতিটি ধাপে বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি সবাইকে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে অধিক পরিশ্রম করার আহ্বান জানান।

সমকাল ৫.০৬.২০১৪

প্রস্তাবিত বরাদ্দে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

'শিক্ষা বাজেট-২০১৪: জাতীয় সংলাপ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, প্রস্তাবিত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষায় ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে ও শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে পৃথক বরাদ্দ প্রয়োজন। শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ধাপে ধাপে ২০ শতাংশে

উন্নীত করতে হবে। তা না হলে শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবেনা।

মঙ্গলবার রাজধানীর পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) মিলনায়তনে ইনস্টিটিউট অব মাইক্রো-ফিন্যান্স (আইএনএম) ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (বিউপি) যৌথ উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন কমিটির সদস্য ড. এম এ বাকী খলিল, বিউপির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির প্রমুখ।

আলোকিত বাংলাদেশ ৮.০৬.২০১৪

প্রশ্নপত্র ফাঁসে যাবজ্জীবন সাজার আইন চেয়ে রিট

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধে জড়িতদের সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে একটি আইন করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করা হয়েছে। আবেদনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনেরও নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে করণীয় নির্ধারণে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আজ বুধবার বৈঠক করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. মো. ইউনুছ আলী আকন্দ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় ওই রিট আবেদন করেন। আবেদনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও সংসদ সচিবালয়ের সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন যুক্ত করে রিট আবেদন করা হয়েছে।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের হাইকোর্ট বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে এ আবেদনের শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন রিট আবেদনকারী আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ। আবেদনে বলা হয়, পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষাসহ সব পাবলিক পরীক্ষা এবং এমবিবিএস, বিডিএস ও সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসহ সব ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে সরকার যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ন্ত্রণ বা দমন আইন করে সে জন্য নির্দেশনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এ আইন প্রণয়নের নির্দেশনা কেন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারির আবেদন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ৫২ জন বিশিষ্ট নাগরিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। তালিকায় রয়েছেন অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, ড. কাজী খলীকুজ্জমান, মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রাশেদা কে চৌধুরী, হারুন-অর-রশিদ, সেলিনা হোসেন, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মেজবাহ উদ্দিন, মুনতাসিন মামুন, এম এম আকাশ প্রমুখ।

সমকাল ১১.০৬.২০১৪

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের খসড়া অনুমোদন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তারা আইন অমান্য করলে তাদের ছয় মাস জেল (শাস্তি), ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও একটি বোর্ড গঠনের বিধান রেখে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪' এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মূলধারা থেকে ঝরে পড়াদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতেই এ আইন করা হয়েছে।

সোমবার জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। দুপুর ২টায় সচিবালয়ে সাবাদিকদের ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশারফ হোসাইন ভূইঞা। তিনি বলেন, নতুন এ আইনটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত ও এ শিক্ষার গুণগতমান আরও বাড়াবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, খসড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে, আর্থসামাজিকসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, অনগ্রসর এলাকায় (হাওর, চর, উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চল) বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দুস্থ জনগোষ্ঠী (পথশিশু, বেকার যুবক ও যুব মহিলা, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী পুরুষ-নারী), প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশু, যুবক ও যুব মহিলারাও এ আইনের আওতায় আসবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, এ আইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে ঝরে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, একক কারিকুলাম অনুসরণ করে এ শিক্ষা সমাপনকারীদের সনদ দেয়া হবে। এ সনদ দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যে কোনো প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী স্তরে ভর্তি হওয়ার যোগ্য হবে। একইভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সনদপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষার্থী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরবর্তী স্তরে ভর্তি হতে পারবে। খসড়া আইনে আরও বলা হয়েছে, পাঠদানের মাধ্যম হবে বাংলা। তবে বোর্ড নির্বাচিত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি বিষয়ও পড়ানো হবে। নৃগোষ্ঠীর জন্য তাদের প্রধান প্রধান স্বকীয় ভাষায় পাঠদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করাসহ বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ ২৪.০৬.২০১৪

চিকিৎসা ব্যয় বেড়েছে

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমেছে। জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে গত অর্থবছরের চেয়ে ৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকা কম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে চিকিৎসা খরচ বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অঙ্কের দিক দিয়ে বরাদ্দ বেশি দেখা গেলেও শতাংশের হিসেবে তা কম। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের চেয়ে এ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে দশমিক ১৫ শতাংশ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। গত বছর স্বাস্থ্যে মোট বাজেটে তা ৪ দশমিক ৬ শতাংশ বরাদ্দ ছিল, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে তা ৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ। বাজেটের আকার বাড়ায় টাকার হিসাবে আগামী অর্থবছরের জন্য গত বছরের চেয়ে ১ হাজার ১৯৭ কোটি ২৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা বেশি বরাদ্দের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থবছরের মতো স্বাস্থ্যে ৪.৬ শতাংশ বরাদ্দ দিলে টাকার হিসাবে হতো ১১ হাজার ৫২৩ কোটি ২৭ লাখ টাকা। কিন্তু ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্যে ৪.৪৫ শতাংশ বাজেট ঘোষিত হওয়ায় টাকার হিসাবে দাঁড়ায় ১১ হাজার ১৭৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা। বিদায়ী অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল ৯ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা। স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন জাতীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. রাশিদ-ই-মাহবুব বলেন, এবারের বাজেট গতানুগতিক। জনসংখ্যা যেহেতু বেড়েছে, তাই টাকার পরিমাণ কিছুটা বাড়বে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গত অর্থ বাজেটের তুলনায় এবার তা বাড়েনি। উবিনিগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার বলেন, স্বাস্থ্য খাতের বাজেট দেখে মনে হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, তাতে সন্তুষ্ট নন তিনি। তিনি বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আরও বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন ছিল।

আলোকিত বাংলাদেশ ৯.০৬.২০১৪

এনজিও-র দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম: মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) সচিবালয়-এর যৌথ উদ্যোগে ৪ জুন ২০১৪ তারিখে এলজিইডি মিলনায়তনে 'বেসরকারি

উন্নয়ন সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম' বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদর্শনীরও তিনি উদ্বোধন করেন। এ আয়োজনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)-এর কো-চেয়ারপার্সন সালাউদ্দিন কাশেম খান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান মিঞাঁ। সভায় আলোচ্য বিষয়ে তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জীবন কুমার চৌধুরী এবং বিইউআইইডি-এর ফ্যাকাল্টি সদস্য জিয়া-উস-সবুর। শতাধিক বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রায় ১৭০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী।

এনামূল হক খান তাপস

কেমন বই চাই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে গত ৯ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্থানীয় সহযোগী সংগঠন প্রাকৃতজন-এর উদ্যোগে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'কেমন বই চাই' শীর্ষক বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্যাম্পেইন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বিকেজেসি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

দিনব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে ক্যাম্পেইন কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনের কার্যক্রম মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথমাংশে অনুষ্ঠিত দলীয় কাজে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর মোট একশ শিক্ষার্থী সরাসরি পাঠ্যবই ও অন্যান্য সহায়ক বই সম্পর্কে তাদের মতামত জানায়। দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের মধ্যদিয়ে প্রাপ্ত মতামতসমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী, বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিজিত কুমার ভট্টাচার্য, হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহান আরা খাতুন, হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আবদুর রউফ, পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব জি কে গউছ, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপকার্যক্রম ব্যবস্থাপক রাজশ্রী গায়েন। প্রাকৃতজনের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সান্ত্বনা আইউব

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে উৎসবমুখর পরিবেশে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল **'হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবো না আর'**। এ উপলক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়।

৪ জুন ২০১৪ সকাল ৮টায় একটি র‍্যালি জাতীয় যাদুঘর থেকে শুরু হয়ে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে শেষ হয়। র‍্যালিতে গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মীসহ পরিবেশ কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিভিন্ন

সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের টুপি ও শার্ট প্রদান করা হয়।

এছাড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫-১১ জুন ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার জন্য নির্ধারিত মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ৭ দিনব্যাপী পরিবেশ মেলা। মেলা উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মেলায় গণসাক্ষরতা অভিযানের দুটি স্টলে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনা ও উপকরণ প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়।

মনিরা সুলতানা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যদের শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন

৮ থেকে ১০ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের শিক্ষা কর্মসূচি

পরিদর্শন বিষয়ক কার্যক্রম।

পরিদর্শন কার্যক্রমে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা, গাইবান্ধা এবং এসেড, হবিগঞ্জ পরিচালিত ৪টি কমিউনিটি ৩১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের ২০১০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় অবস্থিত লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করানো হয়। এ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সে অভিজ্ঞতাসমূহ নিজেদের এলাকায় কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে কাজে লাগানো। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীগণ পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করেন।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

প্রাথমিক শিক্ষায়ন সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন

২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন-এর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে গণসাক্ষরতা অভিযান স্থানীয় পর্যায়ে 'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন' আয়োজন করছে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও সংশ্লিষ্ট এনজিওসহ ২৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীরা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা

বিদ্যালয়সমূহের মানোন্নয়নে কতটুকু ভুমিকা রাখছে এবং এ সংক্রান্ত পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০১৪ তারিখ সচেতন, রাজশাহী ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে 'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন' এর আয়োজন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্ত সদস্য সংগঠনসমূহের মোট ২৬ জন প্রতিনিধি এই ফলোআপ ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সাইফুল ইসলাম, শিক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় শিক্ষা অফিস, রাজশাহী। পরিচালনায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন মো. মিজানুর রহমান আখন্দ, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান, ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মিজানুর রহমান আখন্দ

প্রধানমন্ত্রীর গণসাক্ষরতা অভিযানের স্টল পরিদর্শন

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৮ জুন ২০১৪ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪'-এর উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে টিকে থাকার মতো দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষাসচিব মোহাম্মদ সাদিক ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক শাহজাহান মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ১২টি স্টল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী গণসাক্ষরতা অভিযান পরিদর্শন করেন এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য সংস্থাসমূহের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের একটি শিশুও যেন পথে না থাকে সে লক্ষ্যে সকলকে কাজ করার আহবান জানান। উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সঙ্গে ইউসেপ বাংলাদেশ, সিএমইএস, এসওএস উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

তাজমুন নাহার

অংশীজনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস: অভিজ্ঞতা ও আগামীর ভাবনা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

জনসচেতনতা উন্নয়নসহ গণমুখী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উদ্যোক্তা সংগঠন, বৃহত্তর সুশীল সমাজ এনজিদের সঙ্গে নানাবিধ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ২২ জুন ২০১৪

ঢাকাস্থ হোটেল রূপসী বাংলা-এ 'অংশীজনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস: অভিজ্ঞতা ও আগামীর ভাবনা' বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শিরিন আখতার, এমপি, সদস্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং জনাব কাজী রোজী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. নূরুন নবী তালুকদার, মহাপরিচালক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জনাব মো. খান হাবিব, মহাপরিচালক নায়েম এবং প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। মতবিনিময় সভায় সভাপতি এবং সঞ্চালক- এর ভূমিকা পালন করেন জনাব রাশেদা কে.চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, অভিযান কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, এডুকেশন ওয়াচ দলের সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমুহ, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং অভিযানের কর্মকর্তাসহ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সম্মানিত অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন জনাব ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি, খন্দকার জহুরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, সিএসআইডি, রঞ্জন কর্মকার, সদস্য সচিব, নির্বাহী কমিটি, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, জাকি হাছান, নির্বাহী পরিচালক ইউসেপ বাংলাদেশসহ আরও অনেকে।

সামছুন নাহার কলি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪

হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবো না আর

- বায়ু মাটি পানি দূষণে, আয়ু কমে দিনে দিনে
- জেগেছে বিশ্ব জেগেছে দেশ, গড়বো দূষণমুক্ত পরিবেশ
- হাজার নদীর বাংলাদেশ, নদী মরলে সবই শেষ
- পৃথিবী একটাই, দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই
- শিল্পবর্জ্যের অভিশাপ, ইটিপি-তে হবে সাফ
- দেশ গড়ি আর সমাজ গড়ি, পরিবেশ আগে রক্ষা করি
- নদী-নালা খাল-বিল জঙ্গল, বয়ে আনে সবার মঙ্গল
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, আসুন, সবাই মিলে রুখি
- নদী-নালা মরছে কারখানার বর্জ্যে, প্রতিকারের জন্য উঠি সবাই গর্জে
- ঘন ঘন বন্যা-খরা-সাইক্লোন-দাবানল, এসবই জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবো, সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বো
- পরিবেশ রক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই
- যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না। নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ময়লা-আবর্জনা ফেলুন
- পরিবেশ রক্ষায় সকলের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

আসুন আমরা সবাই মিলে নিজেদের স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশসম্মত সুন্দর নগরী গড়ার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪১ আষাঢ় ১৪২১ জুন ২০১৪

বিশ্ব পরিবেশ দিবস সংখ্যা

স ম্পা দ ক

একদার প্রমত্তা যে পদ্মায় রবীন্দ্রনাথের ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ গল্পের শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল, সেই নদীটি কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের সবার চোখের সামনে! যে বৃক্ষরাজির সুশোভন সৌন্দর্যের জন্য এই সেদিনও সুখ্যাতি ছিল এই চেনা ঢাকা শহরের, তার সবুজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ধোঁয়া আর ধুলোয় ভরা ঢাকার আকাশকে এখন আর সুনীল বিশেষণে ভূষিত করা যায় না। বুড়িগঙ্গা নামে যে নদীতীরে এই নাগরিক জীবন বেড়ে উঠেছিল এক পরম স্বাভাবিক কালপরিক্রমায়, অনাদি অতীতের গর্ভে জন্ম নেয়া যে নদীর প্রারম্ভিক নামকরণই ঘটেছিল ‘বুড়ি’ উপসর্গ দিয়ে, সেই ঐতিহাসিক নদীর এক কণা জলও আর পানযোগ্য নেই এবং এই যে চরম নদীঘাতি অবস্থা সে-ও প্রায় কুড়ি কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল। এ নদীতে আর কোন মাছ নেই, এই নদীর যে কোন প্রান্তের আলোকচিত্রই আমাদের কাছে অন্ধকারের বার্তা বহন করে আনে।

দূষণ শব্দটাই যেন তার আদি ধার হারিয়ে ফেলেছে। দূষণের মধ্যে বেঁচে থাকার এক বিচিত্র কৌশল রপ্ত করে ফেলেছি আমরা। দৈনন্দিনতায় একদিন যা সমস্যা বলে চিহ্নিত হত, আজ তা এমনই বাস্তবতা যে, আমরা তা অকপটে মেনে নিয়েছি। দূষণ থেকে বাঁচার জন্য খর্বশক্তির কাপড়ের মুখোশ পরছি, ফরমালিন খেয়ে জীবনকে বিপন্ন করার বেপরোয়া ভাব প্রদর্শনে যেমন অনেকেই নির্বিকার, তেমিন মধুমাসেও বাঙালির ফলাহারের ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে বহু মানুষ এক ভিন্নধর্মী বৈরাগ্য প্রদর্শন করছে।

কিন্তু জলবায়ু বা পরিবেশের এই বিপর্যয় এখন আর কোন স্থানীয় সংবাদ নয়। অথবা তার একটা স্থানিক পরিচয় থাকলেও মূল উৎসটা খুঁজে পেতে আমাদের মহাদেশীয় ভৌগোলিক সীমানা পার হয়ে যেতে হবে। এই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ছয় বছর আগে মাত্র এক বছরেরও কম বিরতিতে আইলা ও সিডর নামে দুই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। তা শুধু দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় মানুষের ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু, সামান্য কুটির শিল্প, মাছ ধরার জাল, ক্ষেতের ফসল, সাজানো সংসার ও বহুদিনের লালিত স্বপ্ন তছনছ করে দিয়ে যায়নি, সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় তা এক মারাত্মক, অপূরণীয় নেতিবাচক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

আর এমন দুর্যোগ যে ঘটেছে, তার কারণ শুধু বাংলাদেশের মানুষদের অনভিজ্ঞতা বা অসচেতনতার জন্য নয়। বৈশ্বিক যে তাপমাত্রা বাড়ছে এবং যা বাড়ছে প্রধানত পশ্চিমা ধনবাদী, ভোগবাদী সমাজের জন্য, তার কুফল ভোগ করতে হচ্ছে এদেশের মানুষকে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়ে তো আমাদের আলাদা করে অঞ্চল নির্বাচনের কোন অবকাশ ছিল না। পৃথিবীর সবাই জানে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে, কেন বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই ভোগবাদী ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করা গেলে একদিন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে মালদ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেকগুলো দ্বীপ, হিমবাহ এসে দখল করবে জনপদ। আমাদের সকলের গভীর ও ব্যাপক ভালবাসার সোনার বাংলা যাবে হারিয়ে। এমন এক অশনি সংকেতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ
সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org